রূপকথার দেশে

প্রণব পাল

রূপকথার দেশে

প্রণব লালা

লীনা
৭২-বি/২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ ১৩৮৭ (১৯৮০)

প্রকাশক ॥ লীনা গুহ, শিবাচল,
কোলকাতা-৭০০০৫১

গ্রন্থস্বত্ব ॥ প্রণব লালা

প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা ॥ প্রণব লালা

মুদ্রন ॥ আর. রায়, সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫১, ঝামাপুকুর লেন,
কোলকাতা-৭০০০৯

দাম ॥ দশ টাকা

আমার মা
সুরঞ্জনার
স্মৃতিতে
নিবেদিত

বড়ো রাস্তা থেকে বাঁ-হাতে একটা কাঁচা রাস্তা। তারপর কড়াই-শুঁটির খেত। খেত শেষ হতেই গাঁয়ের সীমানা।

দূর থেকেই দেখা যায়—বিরাট একটা বটগাছ। সেই গাছের ছায়ায় প্রকাণ্ড একটা পুকুর। শ্রাবণ মাসে সেই পুকুর জলে টইটুম্বুর, একদম ছাপাছাপি। সেই পুকুরকে তখন কেউ চিনতেই পারে না। আর অতো পদ্মফুল—মনে হয় যেন পদ্মফুলের বন। একেক সময় জলটল দেখাই যায় না।

পদ্মপুকুর। আর সেই ঝাঁকড়া-মাথা বটগাছ। সন্ধ্যাবেলা ওকেও চেনা যায় না। সাত রাজ্যের পাখিতে ছেয়ে যায়। মনে হয় পাখির বন।

পদ্মফুলের বন। আর পাখির বন। কাছাকাছি। একটিতে ভরা রঙ, অন্যটিতে শব্দ।

আজকাল দাসেদের জয় আর ওর তিন চাকার সাইকেল চালায় না। ওঃ, কী বাঁইবাঁই, কী বাঁইবাঁই—সাইকেলে ঘুরছে তো ঘুরছেই। ক'দিন থেকে ওর সাইকেলের টিনটিন আর শোনা যাচ্ছে না। কী ব্যাপার? একদিন দেখি লক্ষ্মণের টিপ-কলের সামনে তিনবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডা। দুটো টিনের ক্যানেস্তারা আর জলের হেঁইয়ো-মারি ছাড়া লক্ষ্মণকে কেউ কোনোদিন দেখেনি। রোগা টিংটিঙে হলে কী হয়, গায়ে দারুণ জোর। আর গালের মধ্যে এক টুবলো পান আছেই সব সময়। পানের খিলি, জলের ক্যানেস্তারা আর লক্ষ্মণ—এ যেন তিনটি বন্ধু। এক মিনিটও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

জয় যে এই লক্ষ্মণের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে নিশ্চয়ই এমনি-এমনি নয়! লক্ষ্মণের গালচাপা ছুটো ছাগলের শিং-এর মতো দুপাশে

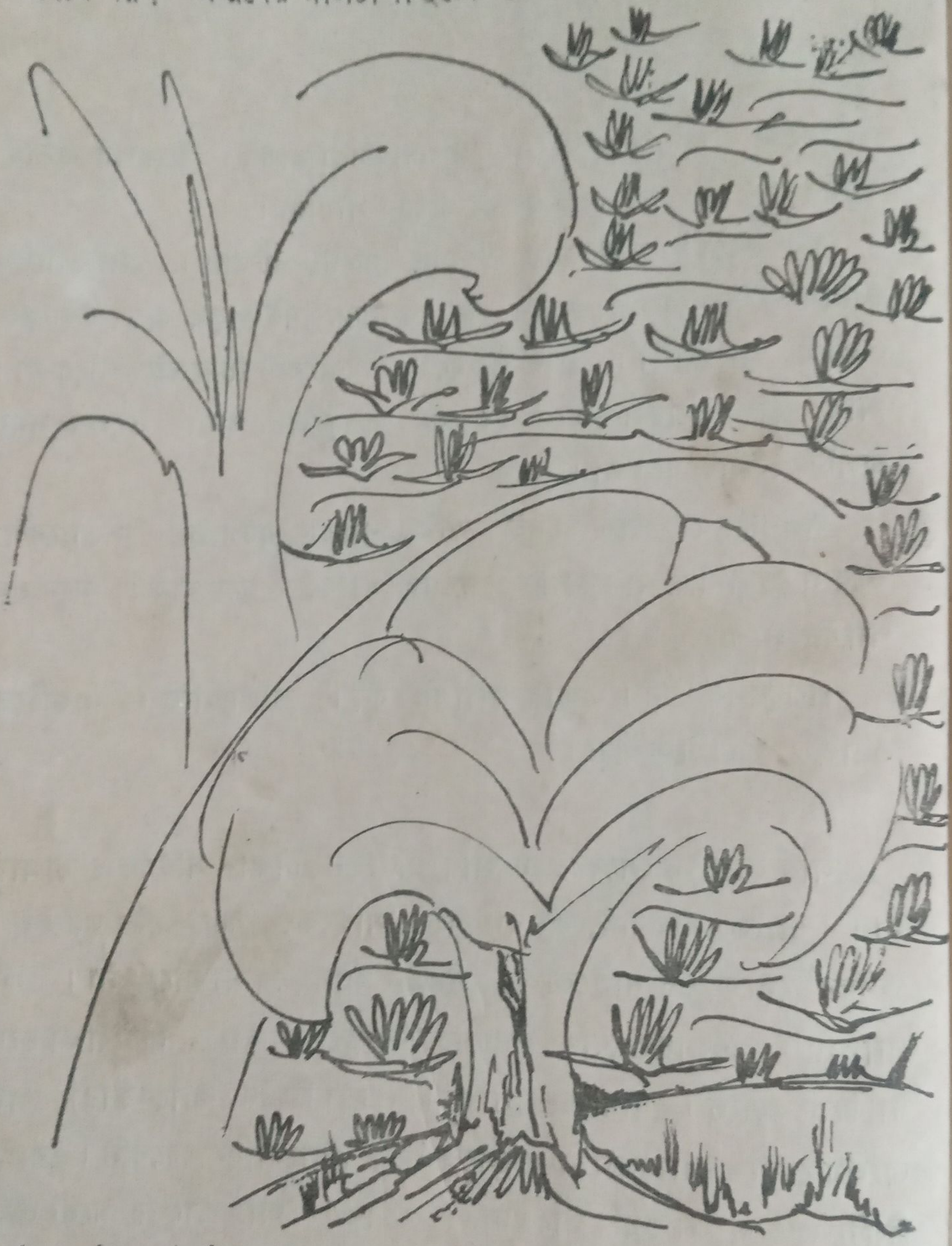

ঠেলে ঠেলে উঠেছে, আর, সবচেয়ে অবাক জিনিস হলো ওর গলার ডিমটা। কটগ্ কগ্ করে উঠছে নামছে যেন তাঁতীদের মাকু—উঠছে নামছে, অবিরাম। যতোবার কথা বলবে ততোবার।

লক্ষ্মণের কথাও তো ফুরোয় না! সে কতো কতো কথা শেষ নেই।

বলে, ওর গাঁয়ে একটা সুপুরি গাছ নাকি আছে এতো লম্বা, পেতে রাখলে পৃথিবীর এপার-ওপার ছুঁয়ে গিয়েও আধহাত বেশী থেকে যায়। এতো লম্বা গাছ নাকি পৃথিবীতে ওই একটিই আছে। এমনকি বিলেতেও নেই, আমেরিকাতেও নেই। এতো লম্বা।

আমার কিন্তু বিশ্বাসই হয় না।

জয়দেব বললো, কেন, ওরকম হতে নেই বুঝি?

আমি বললুম, সবচেয়ে লম্বা গাছ আছে আমেরিকায়। তাদের নাম সিকোয়া।

এঃ, সিকোয়া আবার নাম হয় নাকি?

জয়দেব আকাশ থেকে পড়ে। দূর দূর, সিকোয়া কি কখনো কোনো গাছের নাম হতে পারে? তাল নারকোল হলেও না-হয় বুঝতুম!

জয়দেবের ওই হলো দোষ। সবতাতেই পাকামো। আর কেবল বেছে-বেছে বিশ্বাস করা। পৃথিবীর চেয়ে লম্বা গাছ, তাও আবার কোথায়? না, লক্ষ্মণদের গাঁয়ে—সেটাও বিশ্বাস করবে কিন্তু সিকোয়া বলে নাকি কোনো গাছের নামই হয় না! উফ, তাও তো আমি পুরো নামটা বলিনি। আসলে নামটা হলো, জায়েন্ট-সিকোয়া। হুঁঃ!

অবশ্যি জয় এসব কি পরোয়া করে?

আর লক্ষ্মণেরও তেমনি। একদিন বললো, জানো না তো, এই যে তোমাদের পদ্মপুকুর তার ঘাটে একদিন, সে অবশ্যি অনেকদিন আগের কথা, তখন তোমাদের ঠাকুদ্দার বাবারও জন্ম হয় নি।

উরে ব্বাস, সে তো অনেকদিন, তাই না? তারপর?

সেই ঘাটে ভোর রাত্তিরে চান করতে যেতো এক বামুনের মেয়ে। নাম তার লখিনী।

যাঃ, লখিনী, তাও কি আবার মানুষের নাম হয় ? জয় বললো।

লক্ষ্মণ অতো সহজে ছাড়বে না। বললো, কেন হবে না ? লখিনী হলো লক্ষ্মীর নাম। হয় না বললেই হলো ? লেখাপড়া করবে না তো জানবে কী করে !

তা, লখিনী চান করতে গিয়ে দেখে, ঘাটের এপার-ওপার আলো করে প্রকাণ্ড এক সিন্দুক। রুপো দিয়ে তৈরী। চোখ ঝলসে যায় এমন ঝকঝকে। তারপর ?

ওর ছিলো খুব সাহস। এই তোমাদেরি সমান বয়স। কিন্তু দারুণ সাহস। গিয়ে দেখে, সিন্দুকের ডালায় বসে আছে ছোট্ট একটা প্রজাপতি। সাত রঙের রামধনুর মতো ওর পাখা, ভোরের আবছা আলোয় ঝিলমিলিয়ে রয়েছে। কাছে যেতেই প্রজাপতি বললো, লখিনী, এই সিন্দুকের ভেতরে আছে অনেক সোনাদানা মণিমুক্তো হীরেজহরত। নিয়ে যাও। এসব তোমার।

লখিনী ছিলো গরীব ঘরের মেয়ে।

ওর বাপ হুম করে চলে যেতো একেকদিন কোথায় না কোথায়। কেউ বলতো, মণিপুর। কেউ বলতো, হবিগঞ্জ। কেউ-কেউ আরো কী সব অন্য নাম বলতো। চলে যেতো। আর ফিরতো সেই ছ'মাস ন'মাস বাদে। ঝোলায় থাকতো শুকনো লংকা, তেজপাতা ধনে মৌরি জিরে। এমনকি নুন ডাল চিনিও। আর কোমরে থাকতো লম্বা একটা গেঁজে। লাল সালুতে তৈরী। একদম টাকা পয়সায় ঠাসা।

লখিনীর মা পৈতে কাটতো তকলি কেটে কেটে।

আর ওদের দাওয়ায় ছিলো আশ্চর্য একটা জলপাইয়ের গাছ— তাতে বারোমাস ঠেসে ধরে থাকতো ডুমোডুমো জলপাই। এই দিয়েই ওদের সংসার চলতো।

লখিনী বললো, যাঃ, তাও কি হয় ? অতো সোনাদানা মুক্তো-

মানিক দিয়ে কী করবো আমি! আমাদের তো মোটে একটা খড়ের ঘর, তাতে অতোবড়ো সিন্দুকটা রাখলে আমরা শোবোই বা কোথায়? দুতিনটে প্রাণী?

প্রজাপতি হলো সেই সিন্দুকের মালিক, পাহারাওলা। থাকে না যেমন কোথাও কোথাও, সেই রকম। বললো, এ কি যে-সে সিন্দুক?

পাতালপুরীতে ছিলো এক সওদাগর। সে জাহাজে করে যেতো দূরের দেশে! কতো কী আনতো ঘুরে ঘুরে। এসব সেই সওদাগরের জিনিস। ওর তো কেউ নেই, তাই তুমিই নাও।

লখিনী বললো, না বাবা! কেউ নেই তাই কি হয়, শেষে সওদাগরের নাতি-পুঁতি কেউ এসে করুক তম্বিতম্বা। নাকি? এই আছি, বেশ আছি। মায়ের করা পৈতে, বাবার কোমরের গেঁজে। আর বারোমেসে জলপাই।

তাতেই হেসে খেলে চলে যাবে বেশ!

প্রজাপতি তুষ্টু হেসে বললো, তা বেশ তো, ধনে লংকা জিরে মৌরিও তো আছে। লখিনী অবাক হয়ে বললো, বাঃ রে, তুমি কী করে জানলে?

জানবো না? আমি হলুম গিয়ে—

এমন সময় বারোয়ারি তলার পথ ধরে রতীশ ঘোষাল রাই-জাগো রাই-জাগো গাইতে গাইতে ঘাটের মুখে এসেই চেঁচিয়ে বললো, কার সংগে কথা বলছিস রে মেয়ে, অতো ভোরে?

সবাই জানতো লখিনী ভোর রাতে নাইতে আসে পদ্মপুকুরের ঘাটে। তখন পাড়ার সবাই ঘুমে ভাসে। ঘুমে ডোবে।

অন্য লোকের গলা পেয়ে যেই না লখিনী পেছন ফিরে তাকিয়েছে অমনি প্রজাপতি ফুটফুটে এক ছেলে হয়ে ওকে নিয়ে হাওয়া। পাহারাওলা তো না, রাজপুত্তুর।

কোথায় লখিনী, কোথায় সিন্দুক, কোথায় কী !

রতীশ ঘোষাল দেখলো হ্যাজাকের মতো ঝকঝকে একরাশ আলো ঘাটের পাশ দিয়ে ঝাঁকড়া-মাথা বটগাছের নীচে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো ! একদম জলজ্যান্ত, চোখের সামনে। কী ব্যাপার ?

তারপর ?

রতীশ ঘোষাল তো ঘাবড়ে গেলো। গিয়ে পাড়ার সবাইকে বললো। যেমন যেমন লখিনীর গলা শুনেছিলো, যেমন যেমন সেই আলোটা গড়াতে গড়াতে বটগাছের তলায় গিয়ে লুকোলো, যেমন যেমন পাখিরা একসংগে ডেকে উঠলো, যেমন যেমন হঠাৎ পূবের আকাশ ফাটিয়ে আবীর রঙের সূর্য উঠলো। সব।

সব শুনে কেউ কেউ বললো, যাঃ, তাই কি কখনো হয় ?

হয় না তো ঠিক, কিন্তু লখিনী কোথায় তাহলে ?

তখন খোঁজ-খোঁজ। খোঁজ-খোঁজ।

পাড়াশুদ্ধ সবাই লখিনীকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলো। তবু ওকে আর কেউ কোথাও পেলো না।

শেষে লখিনীর মা ঘাটে এসে দেখে ওমা, সত্যিই তো, বটগাছের তলায় চার-চারটে চাকার দাগ, যেন কেউ গাড়ি হাঁকিয়ে এক্ষুনি চলে গেছে! সেই চাকার দাগ গিয়ে গিয়ে পদ্মপুকুরের তলায় হারিয়েছে।

দেখলো সবাই।

গল্প শুনে আমাদের তো দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি !

লক্ষ্মণ তার ফতুয়ার পকেট থেকে সেই চকচকে কৌটোটা বের করে। তাতে আছে কেয়া-খয়ের আর চুয়া-শুন্‌ডি। তাই এক চিমটি মুখে পুরে হেসে বললো, বুঝলে বাছা, এসব কি আর আজকের কথা, বলে তখনো তোমাদের ঠাকুদ্দা মশায়ের বাবারও জন্ম হয়নি !

তুমি এসব জানলে কী করে, লক্ষ্মণদাদা ? জয় বললো।

মুচকি হেসে লক্ষ্মণ বললো, সেই তো—! কী করে জানলুম!

তারপর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে জলের ভার নিয়ে অংগনাদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। তাকাতে তাকাতে হঠাৎ মনে হলো সেই লম্বা সুপুরিগাছটাই যেন হুম হাম করতে করতে দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

তখন ছিলো ফাল্গুন মাস।

বিকেলগুলো রোজই একটু একটু করে লম্বা হচ্ছে।

রাতগুলো এখনো একটু একটু শীত-শীত, ভোরগুলো টলটলে ঝলমলে। ফাল্গুন মাসে প্রজাপতিরা নতুন ফুলের গন্ধে তিরতির তিরাতর করে ওড়ে, এখামে-ওখানে বসে কী যেন ভাবে, তারপর আবার উড়ে যায়। কেউ প্রজাপতিদের এইসব অবাক কাণ্ড দেখে না-হেসে পারে না।

আমাদের কিন্তু একটুও হাসি পায় না।

প্রজাপতি দেখলেই আমাদের লখিনীর কথা মনে পড়ে।

একদিন এক লম্বা বিকেলে জয় বললো, যাবি পদ্মপুকুরে?

গিয়ে?

চল না আগে, গিয়ে একটা জিনিস দেখবো। যাবি তো চল। আমি এই চললুম।

পদ্মপুকুরে যেতে হলে রায়েদের কালমেঘের বাদাড় পেরোতে হয়। ছোটো ছোটো গাছ, কিন্তু কী তেতো, উফ, কেন যে ওগুলো অতো তেতো হয়! রায়েদের ঝন্টু বলে, ওতে দারুণ কাজের ওষুধ হয়। লিভারের ব্যামো সেরে যায়। সেই জংগল পেরিয়ে বারোয়ারি তলা। তারপরই পদ্মপুকুর।

আমরা ছুটিতে মোয়া খেতে খেতে ঘাটে এসে দেখি তখনো পাখিরা

ফেরেনি। তখনো পুকুরের জল হলুদ রোদে পেতলের মতো হয়ে আছে। এখনো বিকেল রয়েছে।

জয় বললো, দেখছিস? বলে লাফিয়ে উঠলো। দেখ, দেখ— অই কচি কচি ঘাসগুলো শীতের মরা পাঁশুটে ঘাসগুলোর ভেতরে হুমড়ে হুমড়ে আছে। দু-একটা আমরুল, দু একটা কুকসিমা এখানে ওখানে। তার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। চলে গেছে এঁকেবেঁকে, অনেক নীচে, ঠিক যেখানে বটগাছের বাঁ পাশের কালচে শেকড়টার শেষ। আমি মাথা ঝুঁকিয়ে যেই না দেখবো বলে একটু নেমেছি পুকুরের কিনারা ঘেঁসে, অমনি ঝুপ করে বেলা পড়ে গেলো।

একদল পাখি-পাখালি ঠিক তক্ষুনি কিচির মিচির করতে করতে বটগাছটার ডালপালায় এসে বসতে লাগলো।

জয় বললো, যাঃ, হলো না। চল, বাড়ি ফিরে যাই।

পরদিন লক্ষ্মণদাদা জল দিতে এলো দশটার পর।

তখন ফাল্গুনের হাওয়া একটু একটু তেতে উঠছে। মা-ও ওকে দেখে অমনি তেতে উঠলো। বললো, অতো বেলায় জল না দিলেই কি নয় বাছা?

লক্ষ্মণ সড়াক করে লম্বা জিভ দাঁতে ঠেকিয়ে বললো, এই বারটির মতন মাফ করুন, মা ঠাকরুন। ঠিক এই বারটির মতন। আর কোনোদিন বিলম্ব হবে না। লক্ষ্মণের এই এক কথা বলার ধরণ! মাঝে মাঝে এমন সংস্কৃত বলে! মা হেসে ফেললো।

তখন আর কী? শুরু হলো গিন্নীদের গল্প। বোসগিন্নী কিরকম তরকারিতে মসলা দিতে হাতময় হলুদ-হলুদ করে শেষে ধুতে ধুতে কেমন ঝালাপালা, এইসব। সাত কাহন।

মাকে বললো, আপনি তো খুন্তির ডগা নিয়ে মশলা দেন, না? তাই তো আপনার হাতদুটি অতো সুন্দর।

আবার মা ঝম করে রেগে উঠলো। মা'র এই এক কাণ্ড, কখন

যে রাগে, কখন যে হাসে—কোনো ঠিক ঠিকানা নেই! লক্ষ্মণ তখন ফতুয়ার পকেট থেকে ঝকঝকে, হুবহু যেন একটা বইয়ের মতো দেখতে, পানের কৌটোটি বের করে পান খেতে বসলো। আর সেই আশ্চর্য দুমুখো জিনিসটি যার এক মুখে চূণ, অন্য মুখে দোক্তা। মজার কাণ্ড।

আমি বললুম, লক্ষ্মণদাদা, বেলা পড়ে গেলে আঁধার নামে কেন? লক্ষ্মণ ভুরু কুঁচকে বললো, ওই তোমাদের এক দোষ! কে যে কোলকাতার বাচ্চাদের অতো অতো ভুল শেখায়!

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বাঃ রে, বেলা পড়লে অন্ধকার হয় না?

লক্ষ্মণ বললো, এখানে দেখছো আঁধার, অন্য কোথাও ঠিক তক্ষুনি ফুটছে আলো। বেলা কখনো পড়ে না। পড়েই আবার ওঠে। এক জায়গায় পড়লে অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠে। এক জায়গায় উঠলে, অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে।

কী এসব, অ্যাঁ?

এসব হচ্ছে আহ্নিকগতি বার্ষিকগতি, বুঝলে? অতো চাট্টিখানি কথা নয়। আমাদের গাঁয়ে এইটুকটুক দুধের বাচ্চারাও এসব দশপাতা জানে।

জানে?

জানবে না? বলছি কী তবে! আমাদের গাঁয়ে রীতিমতো পাঠশালা আছে না? তোমাদের মতো ইষ্টিং মিষ্টিং ইংরিজী নয়! আমাদের গাঁয়ে আছে একটি বুড়ো, বয়স যে কতো কেউ তা জানে না, দুতিনশো বছর হতেও পারে। কেউ তা জানে না। সে জানে না এমন কিছুই নেই। সেই যে লখিনীর গল্প বলেছিলুম না? সে-ও তো ওর কাছেই শোনা।

আমি বললুম, দুতিনশো বছর মানুষ বাঁচতেই পারে না। কী বলছো যা-তা!

জয় হলে বলতো, ধেৎ, লক্ষ্মণদাদার যতো গাঁজা-গ্যাজালি।

এঃ, লক্ষ্মণ গায়ে না মেখে বললো, এঃ, যা-তা? না? আমাদের সেই বুড়ো লখিনীর সংগে এক্কা-দোক্কাও খেলেছে। ওই যে বললুম না সব তাতেই তোমাদের সন্দ! পৃথিবীতে কতো রকম কাণ্ড হয় তা তোমরা সব জানো? কী?

লক্ষ্মণদাদা চটে উঠছে।

মা বললো, যাঃ, কেন ওকে রাগাচ্ছিস? তোরা কি ওর চেয়ে বেশী জানিস?

লক্ষ্মণ একগাল হেসে বললো, দেখুন তো, মা-ঠাকরুন! তারপর আরেকটুখানি চুয়াগুন্ডি গালে পুরে বললো, দুশো তিনশো তো হতেই পারে, দুতিন হাজারও হতে পারে। কারো কারো বয়সের গাছপাথরই হয় না, জানো? বয়সটা ওদের কাছে কিছুই নয়। চন্দ্রের মতো, সূর্যের মতো। মুচকি হেসে লক্ষ্মণ উঠে পড়লো। যেতে যেতে পকেট থেকে সরু পেনসিলের মতো একটা নল বের করে বললো, এটা কী, জানো?

বলে যেই না তাতে দিয়েছে ফুঁ, অমনি হাজার হাজার ছোটো বাড়া নানারঙের বেলুনে জায়গাটা ভরে গেলো!

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

ফাল্গুনের রোদ পড়ে বেলুনগুলো রামধনুর মতো জ্বলতে লাগলো।

লক্ষ্মণ একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

আমি দেখলুম, লাল নীল সবুজ হলুদ পলকা বেলুনের রাজ্যে লক্ষ্মণদাদা যেন সেই লম্বা সুপুরি গাছটার মতো দৌড়োতে দৌড়োতে চলে যাচ্ছে।

পেছনে হুমহাম শব্দ আর ঝিলমিলে হাওয়া।

এমন সময় জয় এলো।

ওর পকেটে একটা আস্ত চকলেট। বললো, নে।

আমি ওকে একদিন একটা জলছবি দিয়েছিলুম। তাতে একটা সায়েব, হাতে গোলাপ ফুলের তোড়া। সেটা ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছিলো। জয় বললো, বড়ো হয়ে ও নির্ঘাৎ সায়েব হবে।

আমি বলেছিলুম, দু-দুটো ফোকলা দাঁত নিয়ে কেউ কি কখনো সায়েব হয়!

জয় বললো, যাঃ, তুই একনম্বরের বোকারাম, ফোকলা দাঁত কি চিরকাল ফোকলা থাকে। দেখিস কেমন ঝকঝকে দাঁত উঠবে দুদিন বাদে। দেখিস—

তারপর খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে বললো, আজ আবার যাবো ওখানে। যাবি?

কখন?

ঠিক যখন মা'রা ঘুমোবে খেয়ে দেয়ে। নইলে আবার কালকের মতো ঝুপ করে বেলা পড়ে যাবে।

কী? যাবি তো?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ।

জয়দের বাগানে এই সময় আবার ডালিয়া ফোটে।

সবার বাগানে যখন ডালিয়া শেষ, কি করে যে ওদের বাগানে তখন আবার ডালিয়া হয়। অবাক কাণ্ড! সেই ডালিয়াগুলো দুপুরের আকাশকে যেন এলোমেলো করে দেয়।

জয় বললো, আর শোন—এইটে নিস সংগে।

দেখি, ছোট্টো একটা আতস কাঁচ।

বললুম এ দিয়ে কী হবে?

ওর বাবা ডাক্তার। তাই দিয়ে পড়ে। এই টুকুন সর্ষে সর্ষে লেখাগুলোও কেমন ডুমো ডুমো হয়ে ওঠে।

বললো, কেবল তর্ক, কেবল তর্ক। কী হবে দেখিস'খন পরে। যাবি তো রেডি হয়ে থাকিস।

এই বলে ও যেমন হুট করে এসেছিল তেমনি হুট করে চলে গেলো।

বাইরে তখনো সেই লালনীল বেলুনগুলো উঠছে নামছে ভাসছে দুলছে। ভেসে ভেসে কোথায় না কোথায় চলে যাচ্ছে। দুলে দুলে মুখোমুখি হচ্ছে। আবার ভেসে ভেসে চলে যাছে। রামধনু যেন হাজারটি হয়ে ভেঙে পড়ছে চারদিকে।

জয়ের গায়ের হাওয়া লেগে বেলুনগুলো আবার উড়তে লাগলো। চারপাশটা কেমন যেন স্বপ্নের মতো রিমঝিম করতে লাগলো।

আমি হবাক হয়ে আছি তো আছিই—

মা এসে কখন যে পেছনে দাঁড়িয়েছে টেরই পাইনি।

বললো, বাঃ, কে করলো রে? জয়?

মা'র চোখ দুটো দুপাশে টানটান হয়ে গেলো—কেউ হঠাৎ দেখলে বলবে যেন ঝলমলে দুটো রক্তকরবীর পাতা!

আমি আনমনে বললুম, লক্ষ্মণদাদা ফুঁ দিয়ে করেছে। কী সুন্দর, না মা?

জয়ের পকেট ভারী ভারী ঠেকছে। দুপাশটা ফুলে ফুলে উঠছে, দেখে মনে হয়, আজ কেবল মোয়া না, অনেক জিনিস আছে।

কালমেঘের বাগানে হঠাৎ থেমে জয় বললো, ঠিক জানিস তো, তোর মা ঘুমিয়েছে? নইলে ডেকে হেঁকে তুমুল কাণ্ড বাঁধাবে। বাব্বা, অতো বড়ো ধুমসী মেয়েকে যেন চোখে হারায়!

হারায় তো হারায়, তোর কী! যাবো না তোর সংগে, যা—

খপ করে আমার হাত ধরে ও বললো, এঃ, না-যাবি, না যাবি, আমার বয়ে যাবে! যা-না, যা—

তারপর সেই বারোয়ারি তলা অবধি জয় আমার হাতটা ছাড়লোই না!

আমি বললুম, দেখছিস, আজ কিন্তু ঢের বেলা। আকাশে কতো রোদ এখনো, ঝকঝক করছে।

ফাল্গুনের রোদ আকাশে যেন পাল তুলে ভাসছে।

চল চল, পা চালিয়ে চল।

দেখি, ওমা, হঠাৎ কখন বটগাছের তলায় এসে পড়েছি।

বললুম, পানকৌড়িরা জলের নীচের মাছগুলোকে কী করে দেখে রে?

জয় বললো, দেখে আরকি, সবাই যেমন দেখে, চোখ দিয়ে!

দূর! তোর ঘটে একফোঁটা বুদ্ধিও যদি থাকে!

কেন?

কেন আবার কী? জলের নীচের মাছকে সবাই বুঝি দেখতে পায়? তুই পাস? অতো যে বকছিস?

যাঃ! আমি কেন, আমার বয়ে গেছে। আমি পাখিদের কথা বলছি—মাছরাঙা-টাঙা। ওরা ঠিকই পায়। পাখিদের চোখে সবচেয়ে বেশী জোর। কুকুরদের যেমন নাকে।

ঘাসগুলো নড়ে উঠছে।

আমাদের চুপ-চুপ পা উঠছে-পড়ছে। ঘাসগুলো দুলে দুলে উঠছে। সবুজ-সবুজ পোকারা ঘাসের গায়ে লেপ্টে আছে এমন নিঃশব্দে, কেউ ওদের দেখতেই পাবে না। ঘাসের সবুজে গায়ের সবুজে মিলেমিশে একাকার।

এইটুকুন পোকাদেরও কিন্তু সব আছে আমাদের মতন, নাক মুখ চোখ—এইসব। জয় বললো।

জয়ের বাবার ভীষণ মোটা একটা বই আছে। ডাক্তারী বই না কী যেন, তাতে একদিন ওইরকম ছোট্টো একটা পোকা দেখেছিলুম,

তার পাখায় খয়েরী রঙের ফুটকি। চোখ দুটোতে কেমন যেন ডোরা-কাটা দাগ। আর কী জাঁদরেল নাম, ড্রসোফিলা মেলানোগাস্টার। বাব্বাঃ!

ঘাসের এই টুকুস পোকাগুলো এক নিমেষেই হাঁপিয়ে ওঠে, তাই একটু ওড়ে একটু বসে। আবার একটু ওড়ে একটু বসে। একরত্তি পোকা, কতো আর পারে! হঠাৎ জয় ফিসফিসিয়ে বললো, চুপ, ওই দেখ। দেখছিস—নীচে? যেখানে বটের কালচে শেকড়টা শেষ হয়েছে? দেখছিস?

বটের কালচে মোটা শেকড়টা বাঁ পাশ দিয়ে চলে গেছে এঁকে-বেঁকে একদম দূরে। ওটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা বাদামী-ধোঁয়াটে পাথর, যেন একটি কুমড়ো, পড়ে আছে পিঠ উল্টে।

আমি আর জয় পা-পা করে নামতে নামতে এসে গেলুম সেই পাথরটার কাছে অবধি। না, কেউ কোথাও নেই। নিঝুম বিকেল। কেউ কোথাও নেই। শুধু একটা একা পানকৌড়ি টুপটাপ ডুব দিয়ে চুনো মাছ ধরছে। সবুজ পোকারা উড়ছে, বসছে। ঘাসেরা দুলছে। কচুরীপানার গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। না, কেউ কোথাও নেই।

মাঘ ফাল্গুনের রোদ আকাশ ঝমঝমিয়ে বেড়াচ্ছে। পাখিরা দূরের মাঠে, দূরের বনে উড়ে গেছে কখন।

জয় বললো, আয়, এই বেলা পাথরটা সরাতে হবে। তুই ওদিকটা ধর, আমি এপাশটা ওঠাচ্ছি, কেমন?

তারপর বললো, দাঁড়া দাঁড়া, পা হড়কে পড়ে যাসনে যেন, তুই যা পলকা! পাথরটা এইটুকু হলে কী হবে, কী ভীষণ যে ভারি! আবার পায়ে কাদাও লেগে যাচ্ছে, তা লাগুক, হড়কে না গেলেই হলো।

জয়ের দিকটা বেশ খানিকটা উঠে গেছে, এবার আমি হেঁইয়ো মারি বলে যেই না একটু তুলেছি অমনি পা-টা একটু টলে গেলো। আর ঠিক তক্ষুনি—

জয় বললো, চুপ, নেমে আয়।

আমরা দুজনে নিঃশব্দে তখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। অনেক নীচে, ধাপের পর ধাপ। ঘাসেরা হারিয়ে গেলো, পানকৌড়ি সবুজে পোকা আকাশ মাটি রোদ—কিছুই আর দেখা গেলো না।

পাথরের ঢাকনা-আঁটা সেই সিঁড়ি দিয়ে আমরা কেবলই নেমে নেমে অনেক দূরে যেখানে বটের শেকড়গুলো আর পৌঁছোতে পারে নি, সেখানে এসে থামলুম।

তখন টুং টাং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। দেখি একটা গাড়ি এই ছাড়ে, এই ছাড়ে। তাড়াতাড়ি করে আমরা তাতে উঠে বসতেই গাড়িটা চলতে শুরু করলো। রুপো দিয়ে তৈরী গাড়ি। চকচকে ঝকঝকে, যেন একটা হ্যাজাক চারদিকে চোখ চেয়ে তাকিয়ে আছে। তার ওপর রামধনু পাখার মতো একটা প্রজাপতি। সেই যে লক্ষ্মণ বলেছিলো। আসলে সিন্দুক নয়, গাড়ি। রুপোর গাড়ি।

আমরা দুজন সেই রুপোর গাড়িতে ভেসে চললুম।

জয় আমার হাতটা ছুঁয়ে বললো, কী, ভয় পাচ্ছিস?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, ওই দেখ, ওই ওই—

গাড়ি চলছে তো চলছেই।

আর আলোর ঝর্ণা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে চারদিকে।

এখন দুপুর না রাত কেউ জানে না।

সবুজে নীলে হলুদে সাদায় লালে বেগনীতে একাকার একসা হয়ে আমরা প্রজাপতির গাড়িতে চলতে লাগলুম।

এখন দিন কি রাত কেউ বলতে পারে না।

এ যেন বৃষ্টির ফোঁটা, যেদিকেই তাকাও একই নিটোল। পূব নেই পশ্চিম নেই ওপর নেই নীচ নেই। নিটোল। যেদিকেই তাকাও সেই একই চেহারা।

আমাদের গাড়িতে আরো অনেক প্রজাপতি। গুটিগুটি বসে

আছে। আর আছে একজোড়া শালিক, তিনটে খাড়াকান খরগোস আর ক'টা গংগাফড়িং। তবে প্রজাপতিই বেশী।

এতোক্ষণ সবাই জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলো। এবার সবাই মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দেখতে লাগলো।

জয় হঠাৎ বললো, দে তো আতস কাঁচটা। কই, দে-না!

ও আতস কাঁচটা দিয়ে এখানে ওখানে জানালায় গরাদে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একসময় আঁৎকে উঠলো।

এইখানটা দেখ ভালো করে।

দেখি একটা ছোট্টো সোনার প্লেট, তাতে গোটা গোটা আখরে কী সব যেন লেখা।

বললুম, এসব কোম্পানীর নামটাম হবে হয়তো। দেখিসনি বারাসতের ইলেকট্রিকের গাড়িতে লেখা থাকে। জেসপের কারখানায় তৈরী?

জয় অবিশ্বাসের গলায় বললো, না, এটা বোধ হয় ধূমপান নিষেধ টিসেদ। দেখছিস না, কেউ সিগারেট টিগারেট খাচ্ছে না। তা-ই হবে।

তবেও বা, বললুম বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে।

আমি যা বলবো ওর ঠিক উল্টোটি বলা চাই, যেন আমারটির কখনো ঠিক হতে নেই! এমন হতচ্ছাড়া মানুষের সংগে বেড়িয়ে কোনো সুখ আছে?

তারপর, অনেকক্ষণ পরে গাড়ি এক জায়গায় এসে থামলো।

কেউ কেউ ফুড়ুৎ-ফাড়ুৎ নেমে গেলো। কেউ কেউ আবার উঠলোও। আমাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলো সবাই।

হাসিটা তো বোঝা যায়।

আমাদের কথা ওরা কি আর বুঝবে? তাই আমরাও চোখে চোখে হাসলুম। জয় বললো, ওদের আমরা যেমন ভাবি তা কিন্তু মোটেও না। ওদের ভীষণ বুদ্ধি।

কি করে জানলি ?

জানলুম আর কি ! ওই দেখ না এইটুকুন শামুকের বাচ্চা সেও টফির কাগজটা হাতে নিয়ে রেখেছে। কোলকাতা হলে মেঝের ফেলে দিতো ! দেখছিস ?

তাই তো ! আমি অবাক হয়ে দেখলুম। মেঝে নোংরা করতে হয় না, তা-ও জানে !

এদিকে কিন্তু কেবলই কেমন কেমন লাগছে।

সবাই মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে কি রকম লাগে না ? অবশ্যি জয় এসব পরোয়াই করে না। ও ফোকলা দাঁতে কথা বলেই যাচ্ছে। বলেই যাচ্ছে। বললো, চল, ওদের সংগে ভাব করি গে।

কা করে ? এমনি এমনি কি ভাব হয় ?

চল না। চল।

আমি আর ও তখন উল্টোদিকের লালপাখা প্রজাপতিটার কাছে গেলুম।

জয় বললো, কী নাম ভাই তোমার ?

প্রজাপতি বললো, আমার নাম ফুলপরী।

যাঃ, তাই কখনো হয় নাকি ? জয়ের সেই অবিশ্বাস-বাতিক আবার।

ওমা, কেন হবে না ? কী বোকা ! আমার নাম ফুলপরী, আর, ওই যে, ওই, জানলার কোণে গাল রেখে বসে আছে, নীলসাদা-নীলসাদা, ওর নাম মেঘপরী। আমি বসন্তের ফুল ফোটাই, ও দেয় বর্ষার জল।

একটু থেমে ফুলপরী আবার বললো, তা, তোমরা কে ভাই, দেখিনি তো আগে কখনো !

বললুম, আমি কিসা আর ও হলো জয়। জয়দেব।

কিসা আর জয়। বাঃ, কী সুন্দর—বলে ফুলপরী একবার আমার গালে একবার জয়ের গালে উড়ে উড়ে বসলো, তারপর আবার নিজের জায়গাটিতে ফিরে গিয়ে ডানা কাঁপাতে লাগলো।

দেখে মনে হলো হাওয়ায় কাঞ্চনের পাতা দুটো যেন দুলে দুলে নাচছে।

জয় বললো, এই ওদের আদর! বুঝলি?

আমাদের চারপাশে তখন অনেক পাখি, অনেক প্রজাপতি ঘিরে বসেছে।

অনেকদিন আগে ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্রের এপাশে টেলিগ্রাফের তারে একটা শ্যামা দেখেছিলুম। যেন ফুলবাবুটি। সেই শ্যামাদের একজন দেখি গাড়ির কার্নিশে হেলান দিয়ে বসে ল্যাজ দোলাচ্ছে। ওই ওদের এক কাজ। শুধু শুধু ল্যাজ দোলানো। ইশারা করে ডাকলুম ওকে।

শ্যামা এসে চোখ পিটপিটিয়ে বললো, টরে টরে টরে। টক্কা টক্কা টরে টরে।

মানে? আমি অবাক হয়ে বললুম, মানে? টরে টরে টরে?

শ্যামা হেসে বললো। ওঃ, তাও জানো না? এ হলো আরেক রকম ইশারার ভাষা। যারা ইশারায় ডাকে, তাদের এই ভাষাতেই জবাব দিতে হয়!

ঘরে হাসির হুল্লোড় উঠলো।

উরেব্বাস! আমি বললুম, ক্ষেমা দাও, বাবা, ক্ষেমা দাও।

শ্যামা চোখ টিপে, ফিক করে একটুখানি আলতো হেসে বললো, চললে কোথায়?

জয় আমার মুখে তাকালো। আমি ওর মুখে তাকালুম। তাই তো?

তখন একজন টুপিপরা মোজাপরা সায়েব পায়রা এসে বললো,

ওরা যাবে হীরেমানিক। এই লাইনের শেষ ইষ্টিশান। ওখান থেকে গাড়ি বদল করে বড়ো লাইনে যাবে সোনানূপুর। সেখানে ওদের খবর আছে। খোদ লাটসায়েবের হুকুম।

লাটসায়েবের হুকুম! বলে কী? তাই শুনে সবাই একটু নড়েচড়ে বসলো।

লাটসায়েবের হুকুম! সে তো সোজা কথা নয়।

পায়রা হলো পরীদের দেশের অফিসার। সে সব জানে। তাকে সব খবর জানতেই হয়। কে কোথায় যায়, কেন যায়—এইসব। নইলে ওর চাকরী থাকে না। তারপর ও আমাদের দুজনকে দুটো ভাইবোন ফুল দিয়ে বললো, এই হলো তোমাদের পাসপোর্ট। পকেটে রেখে দাও। তোমাদের দেশে খুব তেমন একটা বেশী লোকের কাছে এ-জিনিস নেই। রেখে দাও যত্ন করে, কাজ দেবে।

দেখি, সত্যিই তো, একটা পাপড়িতে আমার মুখের ছবি, অন্যটাতে জয়ের! ঠিক যেমন পাসপোর্টে থাকে না, সেই রকম।

আর কমলায় হলুদে মেশানো একটা আশ্চর্য প্রজাপতির ছবি তার মাঝখানে। তার ডানায় জ্যোৎস্নার মতো সুন্দর মিষ্টি সাদা উছলে উছলে পড়ছে।

আমাদের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

পরীদের রাজ্যে কেউ যদি আসে তাকে একবার রানীর সংগে দেখা করতেই হয়। ওদের রানী থাকে শিশিরে শিশিরে, শিরীষ কি কৃষ্ণচূড়ার রেণুতে রেণুতে। তাকে খবর দিতে হয় আগে থেকে, নইলে দেখা হয় না। কখন যে কোথায় থাকে তার হিসেব মেলাই ভার—শিরীষে না বকুলে, শিমূলে না অশোকে? খবর দিতে হয় আগে থেকে।

জয় বললো, এসব তাহলে তো প্রজাপতিই নয়। তাই না?

না। সব পরী।

আমি তখন পরীদের কথা বেশ বুঝতে পারি।

জয় তো আগে থেকেই পারতো।

আমাদের ভাষাও ওরা টক করে বুঝে ফেলে।

এ দারুণ একটা মজা হলো। আমরা ছুটিতে বেশ আছি। কখনো ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে, কখনো ঝর্ণার জলে নেয়ে, কখনো সোনাবেলায় লুটোপুটি করে।

আমাদের অনেক বন্ধু। অনেক অনেক। আর সব্বাই পরী।

আর আছে খরগোস, পাতিহাঁস, শালিক, দেয়ালীপোকা। আরো কতো রকম। আর সব্বাই বন্ধু। ঝুমকোলতাদের দুটো নোলকপরা মেয়েও আমাদের বন্ধু হয়েছে।

আর আছে সেই ন্যাওটা কাঠবিড়ালটা। কিছুতেই আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। যতো বলি, যা না, একটু ঘুরে টুরে আয় এদিক-ওদিক, কিছুতেই যাবে না, কেবল নাকফুলিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বসে থাকবে! এমন ন্যাওটা। কী আর করা! সে আছে তো আছেই।

একদিন বললুম, আমরা যাচ্ছি রানীর সংগে দেখা করতে। এবার তুমি কেটে পড়ো, কেমন?

কাঠবিড়াল এসেছে তরাইয়ের ভুজপাতার জংগল থেকে।

বললো, ইশ্, কেটে পড়ো বললেই হলো। অতো সোজা? আমার ছুটি কেউ দিতে পারে না।

সে আবার কী কথা?

ওই তো!—আমার ছুটি আমিই নিই! ইচ্ছে হলে! যদি ইচ্ছে হয়।

জয় বললো, বেশ তো, তাই হোক এবার তাহলে। আমরা তো রানীর কাছে যাচ্ছি।

বেশ তো, যাও না। আমিও আছি তোমাদের সংগে।

জয় আর কথা বাড়ালো না। বসে থাকলো হাঁড়ি-মুখো হয়ে।

এইসব দেখেশুনে হঠাৎ আমার দারুণ হাসি পেলো। পরীর দেশে এসে কেউ কি কখনো হাঁড়ি-মুখ করে থাকে ?

থাকে না।

তাই বললুম, বেচারা ন্যাওটা ; এসেছে সেই কোত্থেকে না কোত্থেকে।

কাঠবিড়াল ল্যাজ ফুলিয়ে বললো, তরাই। কে-না শুনেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বন। সেখানে কতো কী আছে—বললে ফুরোয় না।

কাঠবিড়ালের গায়ে সাদা সাদা ডোরাকাটা। ছুঁচোলো মুখে কুটুস দাঁত। দেবদারুর কুঁড়ি আর বাদাম পেলে একগাল হাসে। বেচারা ন্যাওটা।

বললুম, এই ডোরাগুলো কী সুন্দর, না রে ?

জয় বললো, সুন্দর না হাতি ! খুব চটেছে মনে হলো।

এসব গায়ে মাখা কাঠবিড়ালের স্বভাবই নয়। ও বুক ফুলিয়ে বললো, তোমাদের কি কিছুই জানতে নেই—ভালো ভালো কথা টথা ? এগুলো হলো রামচন্দ্রের হাতের দাগ। পড়োনি ? বইয়ে লেখা আছে।

আমি বললুম, তাই নাকি ?

তবে আর কি বলছি ? সেই যুদ্ধের সময় আমরা সাগরে কতো নুড়ি ফেলেছিলুম। তাই খুশী হয়ে রামচন্দ্র আমাদের কোলে তুলে আদর করেছিলো। গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো।

জয় অবাক হয়ে বললো, তাই নাকি ? কই দেখি তো !

জয়ের হাঁড়িমুখ আবার খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠলো। ন্যাওটা কাঠবিড়ালের ল্যাজ গর্বে ফুলে উঠলো। এগুলো হচ্ছে সেই রামচন্দ্রের আঙুলের দাগ। বুঝলে ?

রানীর সঙ্গে দেখা করতেই হয়। এইটেই রেওয়াজ।

কিন্তু রানীর তো কোনো বাড়ি নেই, যাকে বলে রাজপ্রাসাদ।

গাছপালা, ফুলপাখি, নদীপুকুর, মাঠ বন আকাশ কোথায় খুঁজবো বলো?

পরীদের রানীর কোনো বাড়িই নেই যে! তবু দেখা তো করতেই হবে, এই এখানকার নিয়ম।

মহা ভাবনায় পড়লুম।

জয় বললো, ওই যে চৌমাথার মোড়ে ঘুড়ি বিক্রি করছে, চল, ওকে গিয়ে শুধোই। চল। কিন্তু যা থুথ্‌ড়ে বুড়ো, হিমসাদা চুল, ও কি সেসব খবর দিতে পারবে? কে জানে।

জয় আর আমি এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুড়িবুড়োর কাছে যাওয়াটাই ঠিক করলুম।

ঠিক আছে, চল যাই।

কাঠবিড়াল ন্যাওটা চলেছে আমাদের আগে আগে।

ওকে দেখে একটা বনমোরগের বাচ্চা কুঁই কুঁই করে দৌড়ে এলো।

কাঠবিড়াল বললো, দাঁড়া, এটা কি তোর দেশের গাঁ যে ডানা ঝটপটিয়ে বেড়াচ্ছিস যেখানে সেখানে? এটা হলো পরীদের রাজ্য, হ্যাঁ। কিচ্ছু সহবৎ শিখলি নে!

মোরগ বললো, যা যা, তুই যেন কতো জানিস! সহবৎ না ঘোড়ার ডিম। এঃ—

জয় বললো, সহবৎ কী রে?

চুপ, চুপ। আমি বললুম জয়কে। সহবৎ জানিস নে? সহবৎ হলো কেতা-কানুন, যখন যা করতে হয় করলে, সবাই বলে, বাঃ, ভারি মিষ্টি তো! পার্কসার্কাসের দাদু আমাকে শিখিয়েছিলো অনেকদিন আগে।

মোরগ কিক-কিক কড়র-কড়র করতে করতে এক ঝলক লাল

বেগনী রঙ ছড়িয়ে উড়ে গেলো। গিয়ে বসলো একটা কল্কেফুলের গাছে। ওর পালকের লালবেগনী কল্কেফুলের হলুদে মিশে ঝিকিয়ে উঠলো। কিন্তু কাঠবিড়ালের সংগে কি ও পারে? কাঠবিড়াল চোখের পলকে ওই গাছের মগডালে উঠে গিয়ে লাগালো ওকে এক ঝাঁকুনি। দুষ্টু হতচ্ছাড়া গেঁইয়া কোথাকার, পরীদের রাজ্যে এসেও স্বভাব গেলো না!

ততোক্ষণে আমরা এগিয়ে গিয়ে ঘুড়িওলার দোকানে বেঞ্চিতে বসলুম। ডুমুরের ডাল দিয়ে তৈরী।

ঘুড়িওলার পাকা দাড়ি ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। ওর মাথায় মখমলের মস্ত একটা টুপি, তাতে লম্বা ঝুলুরি। হিমসাদা চুল উড়ছে এলোমেলো। আর ওর লাল টুকটুকে কামিজের বুকে মস্ত একটা জিরাফের ছবি।

বললুম, ভারি মজার কাণ্ড তো! অতোসব এ ও তা থাকতে জিরাফ কেন বুকে?

ঘুড়িবুড়ো বললো, আর বলো না। কথা কি কার শোনে? এসব ছবিপরীর কীর্তি!

একেকদিন একেক রকম করে এঁকে দিয়ে যায়। এই দেখো না, আজ হলো জিরাফ, কাল ছিলো ভীমরাজ, তার আগের দিন ছিল বেলফুল। কবে যে কী, কেউ তা জানে না।

অবাক বলে অবাক! রোজ একেক রকম। কী মজা! না?

তোমরা বুঝি নতুন এলে এ পাড়ায়? ঘুড়িবুড়ো বললো।

হ্যাঁ, এই তো খানিকক্ষণ। আমি আর এই ও হলুম বন্ধু। থাকি চম্পাহাটিতে, একপাড়ায়।

তা বেশ। তা বেশ। ঘুড়িবুড়ো বললো।

আমরা হাসলুম।

তা, ঘুড়ি নেবে, ঘুড়ি? অনেক রকম আছে, এই দেখো!

কী করে নেবো? আমাদের তো পয়সা নেই!

শুনে না বুড়োর কী হাসি! দুলে দুলে হাসি। মাথা ঝাঁকিয়ে, দাড়ি কাঁপিয়ে সে কী হাসি, কী হাসি! হাসির যেন বান ডেকেছে।

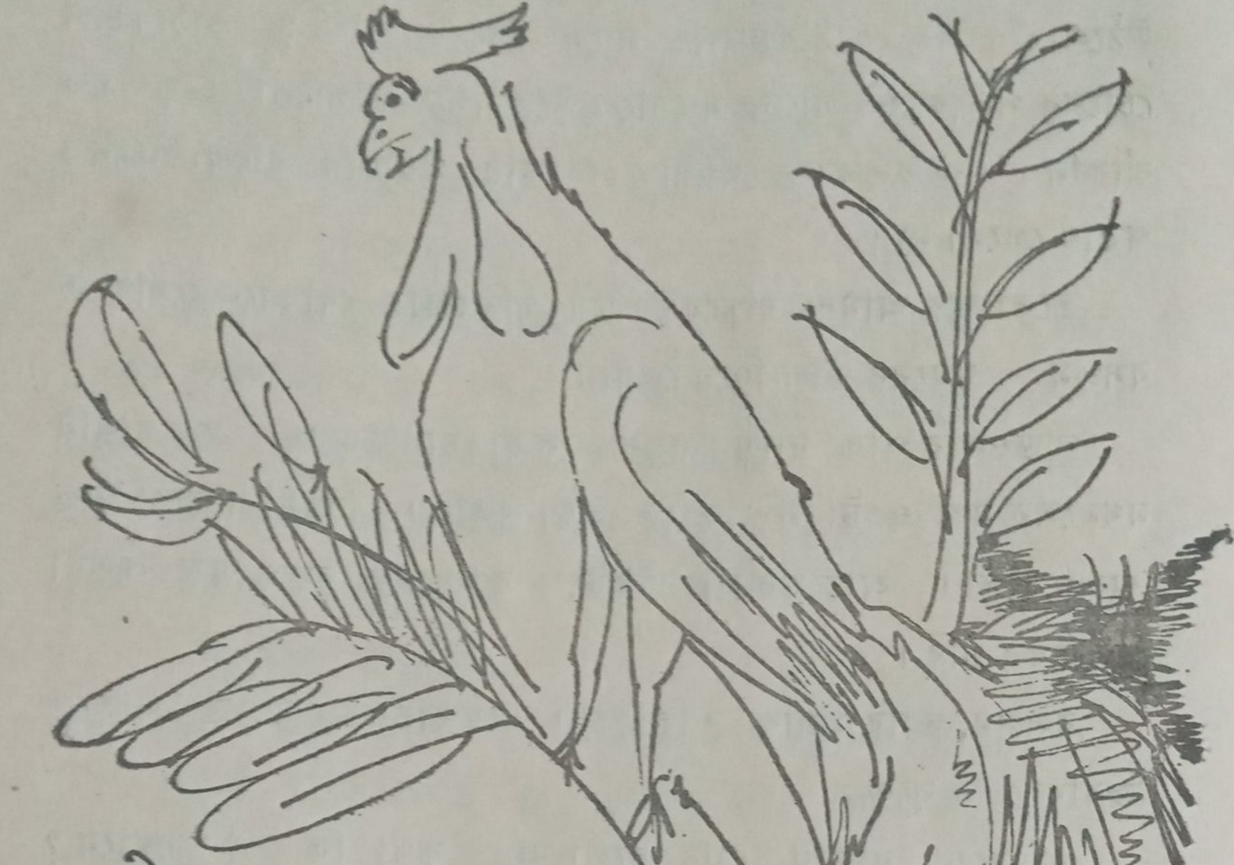

শেষে হাসি থামিয়ে বললো, পয়সা আবার কী! ঘুড়ি বেলুন ভেঁপু—আর আছে ওই যে হাঁড়িতে, আম সন্দেশ। নেবে তো নাও। পয়সা দিতে হবে না।

জয় বললো, তাই কি হয় ?

কেন হয় না, শুনি ! এ-যে পরীদের রাজ্যি। এখানে কেনাও নেই, বেচাও নেই। যার যেমন ইচ্ছে সে তেমন নেয়। ফুরিয়ে গেলে আবার এসে নিয়ে যায়। কিন্তু এই যে দেখছো দোকান, এতে কোনো কিছুই শেষ হয় না কখনো। ইচ্ছেও ফুরোয় না, স্বপ্নও ফুরোয় না। এই এক মজা।

বাঃ, কী অবাক কাণ্ড ! আমি বললুম।

অবাক বলে অবাক। জয় বললো। এমন তো কখনো শুনিনি।

তাই তো। ঘুড়িবুড়ো হাসতে হাসতে বললো আবার। যতো সুন্দর, সব আছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে। নেবে তো নাও'সে।

জয় বললো, কোত্থেকে আসে ওসব ? ফুরোয় না-যে বললে !

ঘুড়িবুড়ো বললো, তা কি আমিই জানি নাকি ? ফুরোয় না, ফুরোয় না। ব্যস !

জয় বললো, ভালো রে ভালো মজা !

আর, নিত্যি নতুন ছবি। আমি বললুম।

ছবিপরী কোথায় থাকে, ঘুড়িবুড়ো ?

তার কি কোনো ঠিক আছে, ভাই ? থাকে এখানে ওখানে। সবখানে।

তারপর একটু কী যেন ভেবে বললো, কেন, তোমার বুঝি ছবি চাই ?

আমি বললুম, বাঃ রে, ছবি আবার কে না চায় ? কিন্তু ছবিপরীর ঠিকানাই যে জানি নে।

ঘুড়িবুড়ো তাই শুনে আপন মনে হাসতে লাগলো।

জয় বললো, কী হলো, হাসছো কেন আবার ?

ঘুড়িবুড়ো বললো, হাসবো না ? তোমরা তো আসল ব্যাপারটাই জানো না, দেখছি।

আসল ব্যাপার ?

হাঁ। যা সবচেয়ে মোদ্দা আসল। পরীর দেশে এসে আবার কি কেউ ঠিকানা খোঁজে? আরে, ঠিকানাই যে নেই। ঠিকানা যার যার মনে। যার যেমন, মনে।

তাহলে?

তাই তো! আমি বললুম আমরা যে রানীর সংগে দেখা করতে যাবো।

ঠিক এই সময় একটা লম্বা-ঠ্যাং লম্বা-গলা বক এলো কোত্থেকে। এসেই বললো, কই গো দাও দি'নি সাত গণ্ডা বাগদা আর তিন গণ্ডা চুনোপুঁটি। ঘুড়িবুড়ো খদ্দের সামলাতে ওপাশে চলে গেলো।

তারপর দুমিনিট বাদে ফিরে এলো। বললো, এই নাও তোমার বাগদা আর চুনোপুঁটি। আর কিছু নেবে?

বক বেশ গম্ভীর চালে বললো, ফাউ ক'খানা দিয়েছো?

দিয়েছি গো, দিয়েছি। বাড়ি গিয়ে দেখো। কদমা, নকুলদানা আর খাগের কলম।

খাগের কলম? এঃ, কী বলছো যা-তা। বক বললো।

হ্যাঁ, নিয়ে তো যাও। কাজে লেগে যাবে দেখো সরস্বতী পূজোয়। এঁটো করো না যেন।

বক কককক কককক করতে করতে চলে গেলো।

উড়লো কম। হাঁটলো বেশী। কিন্তু কী হাঁটা, কী হাঁটা, উঃ!

আর অমনি এলো এক কৈ।

কৈদের ওই হলো মজা। জলে তো থাকেই, ডাঙাতেও বেশ কান্‌কে কান্‌কে হাঁটে। পরীদের দেশে অন্য মাছেরাও ডাঙাতে বেশ চালিয়ে নেয়—নদী আর পুকুরের লাগোয়া ডাঙায়।

কিন্তু ওরা তো আর কৈদের মতো কানকো দিয়ে হাঁটতে পারে না, বেশী দূর যে যাবে!

কৈ বললো, দাও দেখি হে, ক'খানা নলেনগুড়ের সন্দেশ।

আর—আর? ঘুড়িবুড়ো ঘাড় কাত করে।

আর কিছু গরমাগরম তেলেভাজা আর ফুলকপির সিঙাড়া। আর, এক প্যাকেট ক্যারাভেন মার্কা তাস।

ঘুড়িবুড়ো ফরমাস যোগাতে লেগে গেলো।

জয় বললো, বড্ডো খিদে পেয়েছে। এই বেলা ছুটো মুখে দিলে হতো!

আমি বললুম, সবই তো পাওয়া যাচ্ছে দেখছি, যে-যেমন চাইছে।

তাহলে? কী খাবি, বল।

ঘুড়িবুড়ো কৈ-বিদেয় করে এসে একগাল হেসে বললো, হ্যাঁ, ঠিকানার কথা কী যেন বলছিলে, তাই না?

আমি বললুম, ঘুড়িবুড়ো, তোমার দোকানে ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার আছে? আর ফ্রেঞ্চফ্রাই? আর মিল্কশেক?

একগাল হো-হো হেসে ঘুড়িবুড়ো অবাক-অবাক চোখ করে বললো, আছে আবার কী গো? সব আছে। সব আছে। যা-চাইবে তা-ই। চাইলে তবে তো সেটা আসবে। নাকি গো?

ঠিক তাই। জয় যা পেটুক! বললো, ঠিক তাই। আর ডে-ভীল্এর আইসক্রিম ছুটো, স্ট্রবেরি, সংগে কাঠের চামচে কিন্তু।

ঘুড়িবুড়োর মতন মজার মানুষ ছুটো নেই। কী কাণ্ড কী কাণ্ড—পলক ফেলতে-না-ফেলতে যা-যা বললুম সব নিয়ে হাজির!

বলে, এই নাও তোমাদের হ্যামবার্গার ফ্রেঞ্চফ্রাই মিল্কশেক আইসক্রিম আর কাঠের চামচে। স্ট্র।

তারপর আবার এক সেকেণ্ড ভিতরে গিয়েই ছুহাতে ছুটো ফুলকাটা কাগজের রুমাল এনে বললো, এই হলো পেপার ন্যাপকিন। সংগে দেয়, ফাউ।

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বললো, তোমরা তো হীরে-মানিকের ছোটো লাইনে এসেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ।

তাহলে ? বকবকস্থা অফিসার দেয় নি তোমাদের ভাইবোন ফুলের পাসপোর্ট ? তা তো হয় না কখনো ! ঘুড়িবুড়ো মহা ভাবনায় পড়লো।

আমরা হৈ হৈ করে উঠলুম, সে তো দিয়েইছে, সেই কখন না কখন ! এই দেখো

সেই আশ্চর্য ভাইবোন ফুলের পাসপোর্ট।

মাঝখানে তার কমলায়-হলুদে মেশানো সাদা প্রজাপতিপরী।

ঘুড়িবুড়ো খুশী হলো। বললো, ঐ খানটায় মনে মনে ছুঁয়ে যা ভাববে, তাই হবে।

রানীর সংগে এমনি করেই দেখা হবে, দেখো।

আমি বললুম ওরা কি করে যায় রানীর সংগে দেখা করতে ? সেই ওরা—পাখিরা পোকারা গেঁড়িগুগ্‌লি শামুক ঝিনুক খরগোসরা ? ওদেরো কি আমাদের মতো ভাইবোন ফুলের পাসপোর্ট আছে ?

জয় বললো, কই, দেখিনি তো !

ঘুড়িবুড়ো বললো, ওদের কখনো পাসপোর্ট-টোর্ট লাগেই না !

কেন ? ওদের সবাই চেনে বুঝি ?

না। সবাই কি সবাইকে চেনে কখনো ? তা নয়।

তবে ?

ওদের চোখে দেখেছো কোনদিন চেয়ে ? ঠিক চোখের মাঝখানে ? যেখানে কালোবাদামী পুঁতিগুলো চিকচিক করে। দেখোনি তো ?

আমরা দুঃখ-দুঃখ মুখে বললুম, ওদের কেউ তো দেখেই না ভালো করে।

ঘুড়িবুড়ো বললো, দেখো এবার থেকে ভালো করে। কেটে খুঁচিয়ে না, ভালোবেসে। ওদের চোখেই ভাইবোন ফুলের পাসপোর্ট, জন্মাতেই। জন্মাতেই ওদের চোখে পরীর দেশের ছবি আঁকা হয়ে যায়।

ভারি মজা তো !

হ্যাঁ। মজাই তো! তাই তো ওরা অতো সুন্দর।

মানুষ কি কখনো এইসব ফুলপাখিদের মতো, প্রজাপতিদের মতো হয়!

আমাদের তখন খাওয়া শেষ।

বললুম, ঘুড়িবুড়ো, তোমার বাড়ি কোথায়?

তাই না শুনে আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতে চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াতে থাকলো। তবু হাসি থামে না। তারপর, অনেকক্ষণ পর হাসি কোনোমতে একটু চেপে বললো, বাড়ি আবার থাকে নাকি আমাদের? আমরা যে সবখানেই থাকি! যখন যেখানে থাকি তখন সেখানেই বাড়ি, সেখানেই ঘর।

বাঃ, কী মজা! আমাদের কেন যে এমন হয় না!

ভেবে ভেবে আনমনা হয়ে গেলুম।

আর নিত্যি নতুন ছবি। আমি বললুম।

ছবিপরী কোথায় থাকে, ঘুড়িবুড়ো?

তার কি কোনো ঠিক আছে, ভাই? থাকে এখানে-ওখানে। সবখানে।

তারপর একটু কী যেন ভেবে বললো, কেন, তোমার বুঝি ছবি চাই?

আমি বললুম, বাঃ রে, ছবি আবার কে-না চায়! কিন্তু ছবিপরীর ঠিকানাই যে জানি নে

ঘুড়িবুড়ো তাই শুনে আপন মনে হাসতে লাগলো।

পার্ক সার্কাসের এক সার্কাসে একবার একটা মজার খেলা দেখেছিলুম। তাতে প্রকাণ্ড বড়ো একটা বল, যার গায়ে নানা রঙের কাঁচ আঁটা, বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। আর চোখ-ধাঁধানো আলো ঠিকরে পড়ছে তার ওপর। এখন যে-রঙ দেখছো, নিমেষেই তা পালটে অন্য রকম হচ্ছে। এমন খেলা কখনো আর দেখিনি।

দাদু বলেছিলো, এ হলো রামধনুকের ফুলঝুরি।

ঘুড়িবুড়োর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে সেই ফুলঝুরিই যেন দেখতে পেলুম। দেখি, আশ্চর্য সুন্দর পাখিপাখালির একটা দ্বীপ। চার-পাশে নীল জল ঝলমল। আর ঘুড়িবুড়ো জাহাজীদের মতন পোষাক পরে লম্বা একটা কাঠের সাম্পানে বসে দাঁড় টানছে। তার মুখে ঝিরঝিরে হাসি।

দেখি জারুল রঙের ফুল-ফোটা ঝাঁকড়া-মাথা একটা গাছে বসে দুটো পাখি টুকুর-টুকুর করে গল্প করছে। অমন মজার মুখের পাখি কেউ কখনো দেখেনি।

জয় বললো, জানিস কী পাখি ওগুলো? নীলপাখা, লালমাথা?

আমি বললুম, তাই তো, চেনা লাগছে না তো?

জয় বললো, ব্যাংগমা আর ব্যাংগমী। ঝুঁটি যার মাথায় সেই হলো ব্যাংগমা।

আর ল্যাজে যার ছিট-ছিট আলপনা সেই বুঝি ব্যাংগমী?

ঠিক তাই। ওদের কাছে অজানা বলে কিছুই নেই।

ঘুড়িঘুড়ো সেই জাহাজীদের পোষাকে উঠে এলো ডাঙায়, সেই আশ্চর্য ফুলের গাছের তলায়। যেখানে পাখি দুটো গল্প করছে আপন মনে।

আকাশে রঙ ধরছে। রঙ ফিরছে। তাঁতীরা যেন গামলা-ভরা রঙ ঢালছে নদীতে। যেন সেই রামধনুকের ফুলঝুরি।

দেখতে দেখতে, ওমা, সেই জাহাজী-পোষাক মিলিয়ে গিয়ে কী সুন্দর ফুল-ফুল পোষাক এখন ঘুড়িবুড়োর! কিন্তু দাড়িগুলো তেমনি দুলছে জলো হাওয়ায়। কে জানে দ্বীপের কী নাম?

ঘুড়িবুড়ো ব্যাংগমীদের গাছের তলায় চিৎ-পাৎ শুয়ে পড়ে বললো, দ্বীপের নাম তিন পহরের মাঠ।

ওপর থেকে ঝুপঝুপ করে নেমে এলো পাখি দুটো।

এসে একটি বসলো ঘুড়িবুড়োর কাঁধে, একটি বসলো একটু দূরে

নয়নতারা গাছের ছায়ায়। বসে পড়ে বললো, সে তো ছিলো তরশুদিনের আগের দিন।

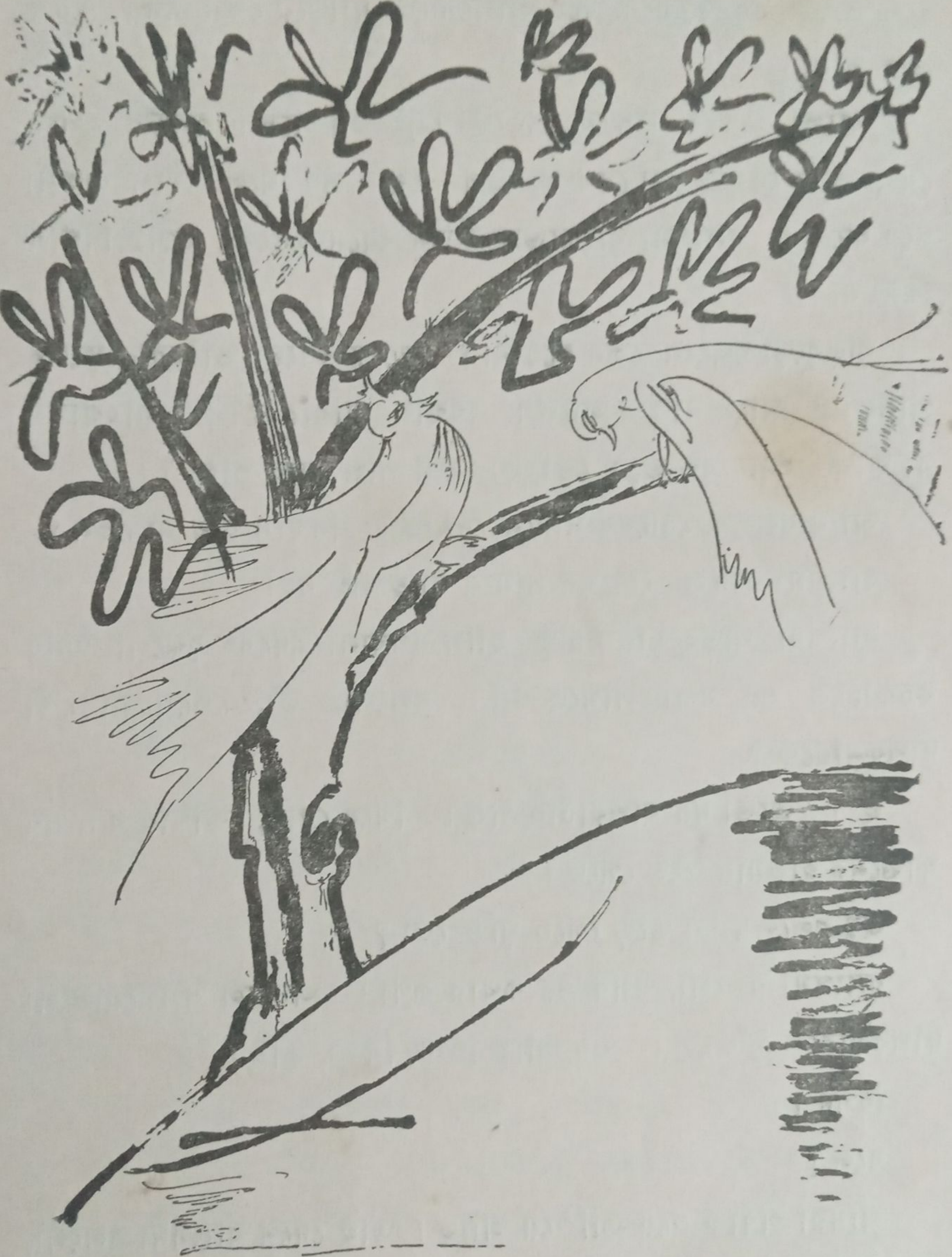

তাই নাকি? সে-ই তরশুদিনের আগের দিন?

হুঁ। আজ হলো মৌরলা।

বাঃ! মৌরলা। জয় বললো, আমাদের দেশের টুকচি মাছ।

ব্যাংগমা আর ব্যাংগমী তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে ঝিরঝির করে হেসে হঠাৎ গুম মেরে গেলো। সে কি ?

বললো, অতো দূরে দূরে আলগোছে দাঁড়িয়ে কেন গো, কাছে এসে বসো।

আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে সেই সার্কাসের বলটির ওপরে যেন, আর দেখতে না দেখতে, এখন-তখন সব মিলে মিশে একসা হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংগমী ঘুড়িবুড়োর কানে কানে বললো, ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না।

ঘুড়িবুড়ো বললো, কেন হবে না ? ওদের কাছে ভাইবোন ফুলের পাসপোর্ট আছে না ? আছে। বিশ্বাস আবার কী ? অবিশ্বাসই বা কী ? এসব বুদ্ধুভুতুম তোবড়া-মুখো পণ্ডিতদের পণ্ডিতী।

আমি বললুম, চোখের সামনে দেখছি। বিশ্বাস হবে না কেন ?

ব্যাংগমী বললো, চোখের সামনে না হলেই বা !

ব্যাংগমা ঘুড়িবুড়োর মুচকি হাসি মুখখানা দেখেই বুঝলো এসব কচকচিতে ওর মজা লাগছে না। বললো, কী, পেলে না তো দীপকুমারকে ?

হুঁ। এতো দূর যাওয়াটাই পণ্ড। গিয়ে দেখি, কোথায় কী, সব ফাগুনের হাওয়ায় উড়ে গেছে।

জয় বললো, কী উড়ে গেছে ঘুড়িবুড়ো ?

ব্যাংগমী বললো, ওসব ওর কথার কথা। আসলে ও গিয়েছিলো দীপকুমারকে খুঁজতে। ওর ভারি বিপদ কিনা, তাই।

বিপদ ?

বলে !

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। তাই দেখে ব্যাংগমা বললো, বলোই না গো গল্পটা গোড়া থেকে।

গল্প পেলে কার না ভালো লাগে ! আমরা নয়নতারা গাছের কাছে ঘন হয়ে বসলুম।

সেই বনের পথে কেউ আসে না। ঘন বন, চাঁদ সূর্যের দেখা মেলাই ভার। সেখানে শাল-পিয়ালের বনের ভেতর একদিন ঘোড়ায় চড়ে তিন বন্ধু এলো বেড়াতে।

দীপকুমার আর জিতকুমার আর মীনকুমার।

তিনজনের তিনরঙের ঘোড়া। একজনের সাদা, একজনের কালো, একজনের লাল। লাল তো নয়, সোনালী-বাদামী।

তিন বন্ধুতে খুব ভাব।

সবাই তাদের তারিফ করে বলে, আহা সোনার টুকরো ছেলেগুলো।

দীপকুমারের সাদা ঘোড়ার কপালে কালো তীরের ফলার ছাপ। তাই ওর নাম তীরন্দাজ।

জিতকুমারের ঘোড়ার ঝকঝকে কালো শরীর, আর হাঁটু অবধি সাদা, যেন মোজা পরে আছে। তাই ওর নাম সায়েব।

আর মীনকুমারের সোনালী ঘোড়ার ল্যাজ থেকে কপাল অবধি কোথাও কোনো খুঁত নেই। সবাই ওকে নিখুঁতি বলেই ডাকে।

এই তিন বন্ধুর তিন ঘোড়া। ঘোড়া তো নয়, মেশিন। দম দেয়া মেশিন, টগবগিয়ে ফুটছে সব সময়।

ঘোড়াগুলো দেখতে যেমন একেক রকম, ওদের গুণও তেমনি নানারকম। তিন বন্ধুরও তিন রকমের গুণ।

দীপকুমার বোঝে পাখিদের ভাষা। আর ওর তীরন্দাজ যখন খুশী তখন যেমন খুশী তেমনি করে সাজতে পারে। পিঁপড়ে হয়ে মৌমাছি হয়ে বাঘ ভালুক হাতি গণ্ডার হয়ে, এমন কি, ইচ্ছে হলে, নদী পাহাড় ঘাস মাটি বন হয়ে মুহূর্তে হারিয়ে যায়। আর সেই সংগে হারিয়ে দেয় তার মনিব দীপকুমারকেও। এই দেখছো সাদা হাতি চলেছে গদাইলস্করী চালে, এই দেখছো টুনটুনি হয়ে উড়ে গেলো বাঁশবনের ওপারে।

যাকে মন চায় তাকেও সে পালটে দেয় পলকে।

জিতকুমার মাথায় সবচেয়ে খাট্টো। মাথায় খাটো, কিন্তু বুদ্ধিতে চৌখস। সে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার ভাষা বোঝে, কথা বলতে পারে তাদের সংগে তাদের ভাষায়। আর তার ঘোড়া কালো শরীর সায়েব। তার আছে ইচ্ছের জোর। তাই দিয়ে অন্যদের ইচ্ছেকে সে পালটে দিতে পারে।

জয় মন নিয়ে শুনছিলো। বললো, সে কেমন?

ব্যাংগমী বললো, তাও বুঝলে না? একজন ভাবছে, গাছে ভরা পাকা ল্যাংড়া আম, খাই পটাপট পেড়ে। সায়েব তাকে গুলিয়ে দিলো, অমনি সে ছুটলো ফুটবল কি কবাডির মাঠে। কোথায় আম কোথায় কী! সাঁতার কাটতে গিয়েছে নদীর পারে, সায়েব তাকে গুলিয়ে দিয়ে তুলে নিলো খিলানমার্গের বরফ চূড়োয়!

সেই রকম আর কি!

আর জিতকুমার ঝটপট আঁক কষে বলে দেবে আকাশের কোন কোণে তারাদের সভা, আর সেই সভায় কে কী বলবে! কে কখন কী করছে তাও বলে দেবে হিসেব করে। পলক ফেলতে না ফেলতে।

আমি বললুম, বাঃ, দারুণ মজার কাণ্ড তো!

মজার বলে মজার! ঘুড়িবুড়ো বললো, রামধনুর রঙফেরার মতন। এই এক রকম, এই আরেক রকম। এই ঘন ঘাসের সবুজ, এই মেঘ-চুঁইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সাদা।

ব্যাংগমী বললো, ঠিক তাই।

তারপর?

মীনকুমার। তারও বেজায় বুদ্ধি।

জয় বললো, আর বুদ্ধি দিয়ে কী হবে? দীপ জানে পাখির ভাষা, ওর ঘোড়া তীরন্দাজ বহুরূপী; জিত বোঝে গ্রহতারার ভাষা, ওর সায়েবের আছে ইচ্ছের মন্ত্র। আর কী চাই? এই দিয়েই তো সব হয়।

ব্যাংগমী বললো, গাছপালা, নদীসাগর, শামুক ঝিনুক আকাশ মাটি,—সে তো সোজা।

চাঁদের আলো সূর্যের রঙ আর গ্রহতারা ছায়াপথ তাই বা এমন শক্ত কী!

শক্ত যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী, মীনকুমার বোঝে তা-ই।

আমরা তো অবাক!

আর কেবল কি বোঝা? বুঝে নিয়ে টক্ করে তার পাল্টা জবাব দেয়া!

ঘুড়িবুড়ো এতোক্ষণ বুঁদ হয়ে শুনছিলো। এবার অস্থির হয়ে বললো, বলোই না বাবা, কেন মিছিমিছি হয়রানি করাচ্ছো?

ব্যাংগমী বললো, মীনকুমার বোঝে বড়োদের আর পণ্ডিতদের ভাষা। সে-সব বোঝা তো যার তার কর্ম না!

বড়োরা যদি বলে, হেন্ করো তেন্ করো।

মীন অমনি বলে, টং বং ঢং।

মানে?

হো-হো করে হেসে ব্যাংগমী বললো, মানে হলো, এই তো করা হয়ে গেলো, এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোও! পণ্ডিতরা যদি বলে, চোপ্! মীনকুমার অমনি বলে, কোআ ফোআ কোপ্! সবাই তো আর চীনেভাষা বোঝে না—অতো পণ্ডিত হলেই বা। তাই বড়োরা ঢিঢ্ হয়ে থাকে। আর ওর ঘোড়া সোনালী নিখুঁতি, সেও ভারি মজার কাণ্ড করতে পারে। সে সোনাকে করে দেয় হাবি-জাবি খোলামকুচি আর মেহনতকে করতে পারে সোনা। তাই বড়োরা আরো বড়ো হয়ে গিয়ে খেটে-খাওয়াদের আরো গরীব করতে পারে না। ওরাও তাই ঢিঢ্ হয়ে থাকে।

দীপকুমার জিতকুমার আর মীনকুমার, এরা তিন বন্ধুতে সব সময় থাকে এক সংগে। তাই পৃথিবীকে ওরা সব সময়ই নতুন নতুন করে গড়ে। আকাশে পালতোলা সাদা মেঘেদের মতন। এখন-তখন সব মিলে মিশে গিয়ে আর আলাদা কিছু থাকে না। এই নিয়েই যতো বিপদ!

ওদের বন্ধু আছে ঢের।

আবার ওদের ভালো বাসে না তেমন লোকেরও অভাব নেই।

তাই কেউ কেউ তক্কে তক্কে থাকে তিন বন্ধুকে কাবু করবার মতলবে। কিন্তু সহজে কি তাই হয়?

বেড়াতে বেড়াতে একদিন ওরা সেই গহন আঁধারের বনে এসে উপস্থিত।

বনের পথে চলতে ওদের কষ্ট নেই। কিন্তু আঁধারে পথ যে দেখাই যায় না। তাই ওরা থেকে গেলো সে রাত্তিরটা বনেই।

বনের সীমানায়, যেখানে মহুয়ার বন হালকা, যেখানে বুনোফল ছড়িয়ে আছে এন্তার। তার পাশ দিয়ে চলে গেছে প্রকাণ্ড একটা নদী। এ নদী সাগরে গিয়ে মিশেছে, অনেক দূরে।

আমলকীর ফল খেয়ে হরিণেরা এই নদীতে জল খেতে আসে দল বেঁধে।

বাঃ, দারুণ বুদ্ধি তো ওদের ! আমি বললুম।

ব্যাংগমী বললো, ঠিক তাই। আমলকী খেয়ে জল খেতে কি ভীষণ যে মিষ্টি লাগে ! তাই না ? বুনো হলে হবে কা, ওদেরও অনেক বুদ্ধি।

সে যাকগে যাক।

সেই বনের পশ্চিমে থাকে এক বুড়ো জাদুকর। লম্বা আলখাল্লা আর ঝুঁটিওলা টুপি পরে থাকে সে সব সময়। সেই জাদুকর জানে ঘুমের জাদু। সেই জাদু সবাই ভাঙাতে পারে না। দীপরা তো নয়ই। সে জাদু ভাঙাতে পারে ঘুমপরী—যে থাকে পরীর দেশে। আর জানে সুবনশিরির রাজকন্যা। সে থাকে সাতসাগরের ওপারে, ঘুম পাহাড়ের গুহায়।

রাত হতে থাকলো।

মীনকুমার বললো এবার শুয়ে পড়া যাক, কী বলিস রে তীরন্দাজ।

তীরন্দাজ বললো, তাই ভালো।

নিখুঁতিও বললো, তাই ভালো।

সায়েবও বললো, তাই ভালো।

অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আবার ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে হবে।

ঘুমোতে সবারই ইচ্ছে, কিন্তু দীপকুমার যেন জেগে থাকতেই চায়।

কেন, কেন? আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ব্যাংগমী একটু ভেবে বললো, আছে গো, আছে, ঝামেলা আছে।

ঝামেলা? জয় বললো, ঠাট্টা রাখো, নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেও ঝামেলা?

ওকি সাধুসন্ত নাকি যে ঠাঁয় বসে থাকবে সারারাত দুহাত মাথার ওপর তুলে?

আমিও দারুণ অবাক হলুম।

ব্যাংগমী বললো, তিনবন্ধু যখন জেগে থাকে তখনই ওদের যার যার বুদ্ধিগুলো খাটাতে পারে, ঘুমিয়ে পড়লে তো তা পারে না। যেমন অন্য সবাই। ঘুমিয়ে পড়লে তোমরা কি আঁক কষতে পারো, নিজের ইচ্ছেমতো করতে পারো কোনো কিছু? ঠিক সেই রকম।

তাই তো!

আমরা মহা ভাবনায় পড়লুম।

ব্যাংগমা বললো, তাই তো! এ তো মহা ভাবনার ব্যাপার! এর কি কোনো উপায় নেই ব্যাংগমী?

ব্যাংগমা বললো, তা কি আর নেই? ওরা তখন সবাই অন্য একটা কিছু হয়ে যায়—ইচ্ছের শক্তি আছে না ওদের, তীরন্দাজ আছে না ওদের? সেই অন্য রকম হয়ে ওরা ঘুমের সময়টা পার করে দেয়। তারপর ঘুম ভাঙলে যে-যার মতন হয়ে গিয়ে যেমনকে তেমন। বুঝলে না?

তখন দীপকুমার বললো, যাকগে যাক, রাত তো প্রায় শেষ—

শেষ? বলে কী? তীরন্দাজ বললো। এই তো সবে শুরু! আমার বাপু তিন পায়ে আর খাড়া-ঘুম পোযাচ্ছে না। যা হোক কিছু একটা করো।

মীনকুমার জিতকুমার সবাই বললো, তা হলে কী হওয়া যায় বলো তো?

বনে বাদাড়ে বিপদের তো শেষ নেই !

তখন সবাই শেষে একমত হয়ে ঝুপ করে ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। মহুয়া গাছের একপাশে ছোট্ট একটি দোপাটি গাছ হয়ে।

দোপাটি ? জয় বললো। সে তো ভারি সুন্দর ফুল। কোনোটা সাদা, কোনোটা গোলাপী। কোনোটা আবার টকটকে লাল— জবাফুলের মতো।

হ্যাঁ। ওই টকটকে লালফুলের দোপাটি হয়েই ওরা সবাই নিঃঝুম ঘুমিয়ে পড়লো। নদী থেকে শনশন করে বইতে লাগলো জলো হাওয়া। মহুয়াফুলের মাতাল গন্ধে সেই হাওয়া ভারি হতে লাগলো ক্রমেই।

বনের পশ্চিম কোণ থেকে দীপদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলো বুড়ো জাদুকর। দেখছিলো আর আপনমনে হাসছিলো।

কাজ বলতে তেমন কোনো কাজ কখনোই থাকে না ওর।

সে আপনমনে বসে বসে কাঁঠাল পাতা দিয়ে বানায় গোরু মোষের সারি। নইলে, বর্ষার দিনে, লেবু পাতার উপর করমচা রেখে গাঙে ভাসায়। কোনোদিন কেবল শুয়ে বসেই কাটিয়ে দেয় ঈশান কোণের হলুদ রঙের নিশান তলায়। ও দূর থেকে দেখছিলো। দেখছিলো, আর আপনমনে হাসছিলো।

দীপদের সংগে ওর দু-একবার এলোমেলো আড়ি টাড়ি হয়েছে। আজ, এই আলো-আঁধারী সন্ধ্যেয়, সে কথা ওর মনে পড়লো।

আর মনে পড়তেই হাসি পেলো ওর।

বুড়ো জাদুকর আলখাল্লার পকেটে হাত রেখে বললো, উই-উ, উঃ। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো সেই মহুয়া গাছের নীচে, সেখানে দীপকুমার মীনকুমার আর জিতকুমার তাদের ঘোড়াদের নিয়ে বিশ্রাম করছিলো। সেখানে এসেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলো বুড়ো জাদুকর।

আর কয়েক ফোঁটা ঘুম ঢেলে দিলো দোপাটি গাছটার ওপর। সে বেশ বুঝলো ওই লাল ফুলের দোপাটিটিই হচ্ছে দীপকুমারের বন্ধু আর ঘোড়া। তীরন্দাজের বুদ্ধিতে ওঁরা দোপাটি হয়ে আছে। ঘুমিয়ে। এ বনে ওই একটিই ছিলো দোপাটি।

তারপর ? ব্যাংগমা বললো, তারপর ?

ব্যাংগমী বললো, তারপর গাছটাকে উপড়ে নিয়ে একটা থলির ভেতরে পুরে টুক করে ফেলে দিলো নদীতে। প্লাসটিকের থলি কিনা, দূর থেকেও তাই দেখা যায়। দীপকুমারেরা থলিশুদ্ধ ভাসতে ভাসতে ঘুমোতে ঘুমোতে চললো কোথায় না কোথায়। জাদুকর উই-উ, উই-উ বলতে বলতে লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরে এলো তার আস্তানায়। যেন কিছুই হয়নি। কেউ যেন কাউকে নদীতেও ভাসায় নি !

দোপাটি চলেছে ভেসে।

মনে হয় শালুক ফুল ফুটে আছে জলে।

এক নদী থেকে অন্য নদীতে। তারপর আরো বড়ো নদী থেকে সাগরে। এক সাগর থেকে অন্য সাগরে। তারপর আরো অন্য সাগরে।

দিন যায়, রাত যায়। রাত গিয়ে আবার দিন আসে। দিন ফুরোয়। রাত ফুরোয়। দীপকুমার আর জিতকুমার আর মীনকুমার —তীরন্দাজ আর সায়েব আর নিখুঁতি চলেছে ভেসে ভেসে। ঘুমের ভেলায়। জাদুকরের থলিতে হয়ে।

তারপর ?

সাত সাগরের ওপারে সোনার গুহায় থাকে স্বনশিরির রাজকন্যা। তার আছে স্বপ্নের জাদু, ঘুমপাড়ানী-ঘুমভাঙানী জাদু। তার হাতের চাঁপাকলির আঙুলের ছোঁয়ায় সংসার জাগে, সংসার ঘুমোয়।

তখন পড়ন্ত বিকেল।

রাজকন্যা বললো, চল, বেড়িয়ে আসি। ওর দুই বন্ধু—যাদের সংগে ও থাকে সারাক্ষণ।

কোথায় ? বললো বন্ধুরা।

ওদের আছে ময়ূরপঙ্খী নৌকো। তাতে করে ওরা বেড়ায়—সাত সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে। সূর্য ওঠে। সূর্য ডোবে। তারা ঝিলমিল আকাশের ছায়া পড়ে জলে।

রাজকন্যা আর ওর দুই বন্ধু। দুই সখী।

সেই পড়ন্ত বিকেলের সোনা-সোনা রোদে রাজকন্যা দেখে লাল পদ্মের মতো কী যেন ভেসে আসছে। রাজকন্যা অবাক হয়ে দেখে। ঢেউ-ভাঙা সাদা ফেনায়, লালরঙের পাগড়ী যেন ! কিন্তু পদ্ম কি হয় নোনা জলের সাগরে ? কী ? কী তাহলে ? রাজকন্যা ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

রাজকন্যা বললো, মাঝি, ওই যে ওই লালরঙের ফুল, সেটা আমার চাই। এক্ষুনি চাই—

কিন্তু চাই বললেই কি পাওয়া যায় ? উথালপাথাল ঢেউয়ের এই সাগরে ?

দোপাটির থলি কাছে আসে দূরে যায়, দূরে গিয়ে কাছে আসে—ঢেউয়ের দোলায় দুলে দুলে। ধরা যায় না। ধরা যায় না। ধরা যায় না।

মাঝিরা হিমসিম খেয়ে যায়। বলে, রাজকন্যা, তাতে বুঝি জাদু আছে।

রাজকন্যা বললো, থাকগে জাদু ! আমার সেটা চাই ! আমার লালফুলের মুকুট চাই। সংসার ভাসুক কি ডুবুক—আমার ফুলের সাজি চাই ! আমার ফুলের সাজি চাই !

রাজকন্যা ক্রমেই রেগে উঠছে।

আরও রেগে উঠলে কী কাণ্ডটাই না বাঁধাবে মাঝিরা তা তো জানে। তাই ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

এদিকে সূর্য ক্রমেই মলিন হয়ে আসছে। দূরের শংখচিলদের আর দেখা যায় না। কুয়াশায় ভরে উঠছে দূরের দিগন্ত।

সাগরের কালো জলে লালরঙ হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আর যতোই সেটা হারিয়ে যাচ্ছে রাজকন্যা ততোই অস্থির হয়ে উঠছে।

সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় মাঝিরা সবাই মিলে দোপাটিগাছের থলিটার নাগাল পেলো।

মাঝিরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। বললো, এই নাও তোমার পদ্মফুল। পদ্মফুল না হাতি! একরত্তি একটা দোপাটি ফুলের গাছ! কোন না কোন বাউণ্ডুলে ছেলের কীর্তি! কেয়াপাতার নৌকোর মতো ছেলে-খেলা। নাও। হলো?

ওফ্! রাজকন্যা খুশী হলো কিন্তু। বললো, কই দেখি দেখি!

বলে যেই না ছুঁয়েছে অমনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো দীপকুমার জিতকুমার আর মীনকুমার—আর তাদের ঘোড়া, তীরন্দাজ সায়েব আর নিখুঁতি।

কী অবাক কাণ্ড!

সবাই হকচকিয়ে গেলো।

ময়ূরপঙ্খী নাও দুলে উঠলো টালমাটাল—ওদের ভারে। কী ব্যাপার?

দীপকুমার বললে, কে তুমি?

সুবনশিরির রাজকন্যা। বললো এক সখী।

তোমরা? জিজ্ঞেস করলো আরেকজন। তোমরা কারা?

এইভাবে ওদের পরিচয় হলো।

ঘোড়ারা টগবগ করে ফুটছে।

চারদিকে অথৈ জল। আকাশ জোড়া আঁধার।

ছিলো ঘনবনের ভেতরে দোপাটি হয়ে ঘুমিয়ে। এ ওরা কোথায় এলো? কী করে এলো?

মাঝি মাল্লারা অবাক হয়ে কী করবে কী বলবে ভেবে পায় না। ঘাবড়ে গিয়ে ওরা নৌকো-বাঁধা দড়িটড়ি নিয়ে এলো। যদি বন্দী করতে হয়? রাজকন্যার মেজাজ তো ওরা জানে!

সায়েব হেসে বললো, বাঁধতে ছাঁদতে হবে না ভাই। আমরা এমনিতেই তোমাদের কাছে বাঁধা হয়ে আছি।

রাখো হেঁয়ালি!

সামাল সামাল করে হৈ হৈ ছুটে এলো ওরা।

আর যেই না কাছে এসেছে অমনি ওরা সবাই এক পলকে ক'টা কাঠপিঁপড়ে হয়ে লুকিয়ে রইলো রাজকন্যার কাছে পিঠে!

অবাক রে অবাক!

ভোজ বাজির মতো মিলিয়ে গেলো? অ্যাঁ?

রাজকন্যা আর তার দুই সখী চোখ রগড়ে আবার ভালো করে চারপাশ খুঁজে পেতে দেখে। কোথায় কী? তিন তিনটে ছটফটে ঘোড়া—যাদের গায়ের গন্ধ আর নিঃশ্বাসের হাওয়া এখনো ওদের গায়ে—হাওয়ায় উবে গেলো? আর তিন তিনটে ঝলমলে ছেলে—যাদের হাসিমুখের আলো এখনো টাটকা ছড়িয়ে আছে ওদের নৌকোয়?

রাজকন্যা মনখারাপ করে থাকলো।

তখন মাঝিরা বললো, মনখারাপ করে কী হবে? তার চে' বরং খুঁজে পেতে দেখাই যাক না। আমাদের ময়ূরপঙ্খী তো আর এইটুকুনটি নয়! অমন দু-দশখানা ঘোড়াটোড়া এর খাঁজে-কোণে কতোই তো লুকোতে পারে।

রাজকন্যা বললো, বেশ, তাই ভালো।

নৌকোয় খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেলো। বাক্স প্যাটরা উল্টে পাল্টে দেখে, কিংখাবের ঝালর, কাশ্মীরের গালচে, হিরণ্ময়ের শাড়ীর আলমারী—সব খুঁজে খুঁজে তোলপাড়। কোথাও কিছু নেই। না মানুষ, না ঘোড়া। তবু খোঁজ-খোঁজ, খোঁজ-খোঁজ—একজন হঠাৎ বললো, অই দেখ অই দেখ পর্দার পেছনে—অই

কোথায় কী? কেউ তো নেই!

একজন হঠাৎ বললো, এই যে, সেই সোনা রঙের ঘোড়াটা—

কোথায় কী? কিসসুটি নেই!

দীপরা হঠাৎ-হঠাৎ নিজেদের চেহারায় ফিরে এসে আবার সেই কাঠপিঁপড়ে হয়ে হারিয়ে যায়। পলকে। এই দেখছি, এই নেই!

মেয়েরা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে।

মাঝিরা হাপিত্যেস হয়ে বললো, জীন জানো, জীন? এসব জীনেদের দল। ভরসন্ধ্যেয় কেন যে ব্যাটাদের তুলতে গেলুম জল থেকে! এখন বোঝো ঠ্যালা! রাজকন্যার যতোসব বেয়াক্কিলে আবদার!

রাজকন্যা অবাক হয়ে ভাবছিলো।

চেঁচিয়ে বললো, কী বললি? ওরে, কে আছিস, দে তো ফেলে ওকে সাগরে—তিনজন লম্বা চওড়া মাল্লা এলো ছুটে। হা রে রে রে—

ঠিক তক্ষুনি, নৌকোর তিন কোণে তিনটে জলজ্যান্ত ঘোড়া চিঁহি চিঁহিহি করে ডেকে উঠলো।

রাজকন্যা বললো, যাকগে যাক। জলে ফেলে কাজ নেই।

মাঝি বললো, মাপ করো, রাজকন্যা। এইবারটির মতন মাপ করো—

জয় বললো, ঘুড়িবুড়ো, এ যেন সত্যিই সেই পার্কসার্কাসের সার্কাস। রঙের ওঠা, রঙের পড়া, রঙের মেশামেশি। আলো—আঁধারের লুকোচুরি। পাওয়া আর হারানো।

ঘুড়িবুড়ো বললো, যেন সেই কী যেন—

আমি বললুম, রামধনুকের ফুলঝুরি?

ব্যাংগমা ডানার ভেতরে ঠোঁট ডুবিয়ে বসে শুনছিলো এতোক্ষণ। এবার বললো, আজ কদ্দূর গিয়েছিলে গো?

ঘুড়িবুড়ো বললো, এই ছুঁই-ছুঁই। সোনা গুহার একটা পাশ ঝিঁকিয়ে উঠেছিলো হঠাৎ-রোদে। প্রায় ছুঁই-ছুঁই।

জয় বললো, তারপর?

ব্যাংগমী বললো, এই লুকোচুরি খেলা চললো। খোঁজাও চললো নাগাড়ে। দীপরা তো অতোদিন একটানা ঘুমিয়েছে, তাই তাদের এখন ঘুমের কোনো দরকার হবে না অনেককাল। এদিকে রাজকন্যারা ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে। তখন ওরা বাড়ির পথে রওনা হলো।

দীপরা সবাই মিলে ঠিক করলো, আর ঘুম নয়।

জিতকুমার আঁক কষে বললো, এসব সেই বুড়ো জাদুকরের কীর্তি। ও আমাদের ঘুমের মধ্যে ঘুম মিশিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলো। এই দেখো—বলে জিতকুমার একটা কাগজের হিসেব তুলে ধরলো।

ওরা দেখলো, জাদুকর, সেই গহনবনের বুড়ো জাদুকর। লম্বা নাক, কুলো কান, ঝোলা আলখাল্লা আর ঝুঁটিওলা টুপি। হুবহু সেই বুড়ো জাদুকর। মহুয়াগাছের নীচে শুয়ে আছে চিৎপাত। আর আপনমনে হাসছে।

উই-উ। উঁই—উম্। ঘুম। ঘুম। উঃ হুঃ হুঃ।

বলে ঝ্যা ঝ্যা করে হাসছে?

দেখে পিত্তি জ্বলে গেলো দীপকুমারের। বললো, রোসো, দেখাচ্ছি মজা। বলে এক মুহূর্তে ও তীরন্দাজের পিঠে বসে উধাও হয়ে গেলো।

বন্ধুরা জিতকুমারের কাগজে দেখলো, দীপ একটিপ নস্যি হয়ে জাদুকরের নাকে গিয়ে সেঁধোলো। আর ওর কী হ্যাঁচ্চো:, কী হ্যাঁচ্চো:!

জাদুকর হাঁচির র‍্যালা সামলাতে সামলাতে দীপ আবার ফিরে এলো সুবনশিরির রাজকন্যার নৌকোয়। এসে বললো, দেখলি মজা। পাজিবুড়ো কোথাকার! ওই হাঁচি বন্ধ করতে ওকে আরো ন'লক্ষ বার হাঁচতে হবে! বোঝো মজা এবার। জাদুকর তো আর জিতকুমারের মতো গ্রহনক্ষত্রের ভাষা বোঝে না, হিসেব জানেনা আঁকজোকের, তাই বেচারা কেবল হাঁচতেই থাকলো রাতদিন। জাদু-টাদু কোথায় যে গেলো ভেসে।

এবার সবাই ওকে হাঁচিবুড়ো বলে ডাকতে লাগলো।

যাক বাঁচা গেলো! বললো জয়, আর এবার ওকে ঘুমপাড়ানী জাদুর খেলা খেলতে হবে না!

ব্যাংগমী বললো, ওরা তো ফিরে এলো সোনা গুহায়। অনেক রাতে। এসে রাজকন্যা সবাইকে বললো, লুকোচুরির খেলায় মেতে গিয়ে অতো রাত হয়ে গেলো।

মাঝিদের বললো, তোরা সব চুপ করে থাকবি সারাক্ষণ। এইসব ছেলেদের আর ঘোড়াদের ব্যাপার যদি রাজামশাই জানতে পারেন ঘুণাক্ষরে, তাহলে গর্দান যাবে তোদের। বুঝলি?

ভালো চাস তো, সাবধান, মুখ খুলবি না। বললো এক সখী।

মাঝিরা ভাবলো, যাকগে মরুকগে। আমাদের তাতে কী? তবে, জীন নিয়ে বাস করা। শেষরক্ষা হলেই হয়!

বলে ওরা যে যার ঘরে চলে গেলো।

ময়ূরপঙ্খী রইলো ঘাটে বাঁধা।

সেখানে ভোজপুরী দারোয়ানরা রইলো পাহারায়। ওদের চওড়া জুলপী, ভারি গোঁফ, জবারঙের চোখ, মুখের কৌন্ হ্যাঁয়, ক্যা হ্যাঁয় আর হাতের পেতল-বাঁধা লাঠির ভয়ে ওদিকে যায় এমন বুকের পাটা কারো নেই।

মাঝিরা ভাবলো, জীন হোক চাই ভূত-পেত্নী হোক, ভোজপুরীদের ঘাটাবে এমন সাধ্যি কার?

রাজকন্যার কড়া হুকুম, দেখবি ঘোড়াটোড়া যেন পালাতে না পারে।

হেড দারোয়ান অবাক হয়ে বললো, ঘোড়া কেমন? ঘোড়া কোত্থেকে আসবে?

রাজকন্যা বললো, চোপ্। যেমন হুকুম তেমনি কাজ চাই। নইলে নির্ঘাৎ গর্দান।

দারোয়ান তখন জী হুজৌর, জী হুজৌর বলতে বলতে ঘটাং করে সেলাম ঠুকে দিলো !

দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছরের পর বছর ঘুরে যেতে লাগলো, দীপকুমারদের আর ঘরে ফেরা হয় না। ওরা আছে মশগুল হয়ে সেই সাতসাগরের ওপারে সুবনশিরির সোনা গুহায়।

রাজকন্যার সংগে ওদের খুব ভাব। ওর সংগে খোলাখুলি সময় কাটে বেশ কিন্তু রাজ্যের অন্য কেউ ওদের কথা জানে না।

এমনকি রাজামশাই পর্যন্ত না।

একদিন ভোজপুরীরা পাহারা দিচ্ছে ময়ূরপঙ্খী নাও। অনেক রাত তখন।

দীপরা ভাবলো অতো রাতে কেউ কি আর জেগে বসে থাকবে, হলোই বা ভোজপুরী। এই ভেবে ওরা সবাই যে-যার ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছে।

আর যেই না বেরোনো, অমনি হেড-দারোয়ান কোন্ হ্যাঁয় বলে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এলো—সংগে একদংগল শান্ত্রী।

ওরা যতো ছোটে, দারোয়ান ততো ছোটে !

ছুটতে ছুটতে সাগরের পার থেকে অন্দরমহলে।

সেখানে, গভীর রাতে, রাজামশাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। বাইরে থেকে শব্দ শুনেই ওরা বুঝলো, এ নির্ঘাৎ রাজামশাই না হয়েই যায় না !

যেমম ভাবা, তেমনি ওরা ঘটঘটিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকেই সুড়ুৎ করে ফুলদানির ফুল হয়ে হারিয়ে গেলো। গিয়ে চুপি চুপি মজা দেখতে লাগলো।

ভোজপুরী দারোয়ানরা তো অবাক।

চোখ কচলে গায়ে চিমটি কেটে দেখে জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে ! তাই তো, এতো ভারি তাজ্জব কি বাত্ !

কিন্তু এসব ভাবার আগেই রাজামশায়ের পেটে প্রকাণ্ড এক ঘা লাঠি!

রাজামশাই মলুমরে, গেলুমরে করে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন, ওরই কর্মচারীরা লাঠি দিয়ে মারছে ওঁকে!

কী ব্যাপার?

তিনি রেগে গিয়ে যেই ওদের গর্দান নিতে বলবেন, অমনি সায়েব ফুলদানি থেকে ওর ইচ্ছের গুণ দিয়ে রাজামশাইয়ের মন ভুলিয়ে দিলো।

উনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভোজপুরীদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বখশিস দিলেন।

ওরাও তো অবাক! কোথায় যাবে গর্দান, শেষে কিনা বখশিশ!

রাজামশাইও কম অবাক হলেন না! মিছিমিছি অতোগুলো টাকা গেলো!

লাঠি খেয়ে রাজামশাই দারোয়ানদের বখসিশ দিয়েছেন শুনে নানালোকে নানা কথা ভাবতে লাগলো।

অনেকে লাঠি মারার দল গড়তে লাগলো। বখশিশ পেতে কে' না চায় বলো, আর রাজাকে লাঠিপেটা করে বখশিশ পাওয়া—সে আবার সেই রাজার হাতেই,—সে তো মহা পুণ্যির কাজ। কাজেই ডজন ডজন লোক রাজা-মারার দলে যোগ দিতে লাগলো।

এদিকে রাজার কাছে বখশিশ পেয়ে দারোয়ানরা তো মহাখুশী।

দুপুর বেলা এরা বিরাট এক ভোজের ব্যবস্থা করলো। ভোজপুরীদের ভোজ বলে অবশ্যি তেমন কিছু দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার না, কেবল দরবেশ আর বর্দ্ধমানের মিহিদানা। ব্যস। এই খেয়ে খেয়ে সবাই লম্বা ঢেঁকুর তুলতে লাগলো।

রাজামশাই মন্ত্রীদের বললেন, এর কারণ খুঁজে বের করতেই হবে!

মন্ত্রীদের সাজ-সাজ পড়ে গেলো। একেকজন একেক রকম বলতে

লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল বেলাই গড়িয়ে যেতে লাগলো, কারণ খুঁজে কেউ বের করতে পারলো না।

রাজামশাই তখন প্যাদা পাঠালেন, ধরে নিয়ে আয় ভোজপরীদের।

ওরা তখন ভুরিভোজের পর একটু গড়িয়ে নেবার তোড়জোড় করছিলো। এমন সময় প্যাদা গিয়ে বললো, রাজামশাই ডেকেছেন। এক্ষুনি। ডবল্‌সে!

শুনে জয়ের তো মুখ শুকিয়ে গেলো।

এ আবার কেমন কথা!

একজন তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললো। যদি বখশিশের টাকা ফেরত চায়?

একজন বললো, যদি গর্দান নেয়?

আরেকজন কেবলই বুক চাপড়াতে লাগলো, আর ঘনঘন জয় রামজী, জয় রামজী, বলতে লাগলো!

ওরা রাজসভায় গিয়ে সেলাম করে দাঁড়ালো সার বেঁধে!

রাজামশাই গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ভুঁড়িতে লাঠি লাগিয়েছিলে কেন? কোনো ভয় নেই, খুলে বলো।

তখন হেড-দারোয়ান বললো, রাজামশাই, ঘোড়া!

রাজামশাই বললেন, ঘোড়া?

জী হাঁ, হুজৌর, ঘোড়া।

অন্য একজন তখন চাপতে না-পেরে বললো, তিন-তিনটে—

কথা শেষ না হতেই রাজামশাই হুংকার ছেড়ে বললেন, চোপ্‌।

হেড-দারোয়ান আরো জোর হুংকার ছেড়ে বললো, চোপ্‌।

তারপর?

হাঁঃ হাঁ। তিনটে ঘোড়া স্যার। একটা সাদা, একটা কালো, একটা সোনালী।

আর, কেবল কি ঘোড়া?

সবাই অবাক! বলে কি?

ঘোড়াপর সওয়ার ভি। তিন-তিনটে ছেলে।

রাজামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

সভার সবাই হেসে উঠলো।

এমন বানানো গল্প কেউ বিশ্বাস করলো না। রাজামশাই হাসি থামিয়ে শেষে বললেন, যা, জেগে থাকিস। ঘুমিয়েছিস কি ঘ্যাচাং গর্দান! বুঝলি?

ভোজপুরী দারোয়ানরা দারুণ ব্যথা পেলো মনে। সবাই যে ভাবলো ওরা বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলছে আর রাজামশাই যে ওদের জেগে থাকতে বললেন এতে ওদের দারুণ অপমান হলো। কিন্তু করবে কী, রাজার হুকুম!

ওরা চলে যেতে রাজামশাই মহা ভাবনায় পড়লেন।

বিকেল হতেই ওরা সবাই বেড়াতে বেরোয় সাগরে। রাজকন্যা ও দুই সখী। আর দীপরা।

ময়ূরপঙ্খী ভাসে কালো জলে।

সোনার সূর্য পশ্চিমের আকাশ থেকে সোনা ঢালে সাগরে।

তীরন্দাজরা একপাশে গিয়ে গল্প করে। গল্প করে আর নজর রাখে চারদিকে।

দীপকুমার, জিতকুমার আর মীনকুমার গল্প জুড়ে রাজকন্যার সংগে।

এইভাবে দিন যায়।

দিনের পর দিন!

মাঝে মাঝে দীপরা কোনো একটা নতুন গল্প গড়ে। কখনো রাণীকে নিয়ে, কখনো রাজামশাইকে নিয়ে, কখনো মন্ত্রী-কোটালকে নিয়ে। ওদের ইচ্ছেয় সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়, ওলট-পালট হয়ে যায়। নতুন হয়ে যায়। কখনো কখনো কেউ কেউ তিনটে হাতি দেখে হেলেদুলে চলেছে মাহুতদের নিয়ে। কেউ কেউ দেখে গণ্ডার,

কেউ কেউ প্রথম তোলা মহল। কিন্তু রাজামশাইকে ডেকে আনতে আনতে সব ফাঁকা। ওরা বর্খাশিশ পায়।

এইভাবে চলছে। দিনের পর দিন।

দিন যায়।

আর রাজকন্যার ভাবনা বাড়ে।

রাজকন্যা এখন দীপদের সব ব্যাপার জেনে নিয়েছে।

ও জেনেছে তীরন্দাজ আর সায়েব আর নিখুঁতির গুণ। জেনেছে দীপরা তিন বন্ধুতে কী কী করতে পারে। আর কী জেনেছে, জানো? সেই যে, ঘুমিয়ে পড়লে ওরা কেউ কিছুই করতে পারে না। সেই গোপন কথাটাও!

সখী বললো, রাজকন্যা, তোমারও তো গুণ আছে। ঘুম পাড়ানী ঘুম ভাঙানী? নেই?

আছে। রাজকন্যা বললো। কিন্তু তাতে কী?

তাতে কী? অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সখীরা। তাই দিয়ে কতো কী-ই না হয়!

রাজকন্যা সখীদের কথা শুনে ভাবতে বসে।

রাজকন্যার দীপকে খুব পছন্দ। কিন্তু দীপ বলে তো একা-একা কিছুই নেই—ওরা তিন বন্ধুতে আর তিন ঘোড়াতে মিলে মিশে একাকার।

সবাই মিলে তবেই ওরা এক—একেকজনের একেকরকম গুণ, তাই।

তাই ওরা সবসময় এক সংগেই থাকতে ভালোবাসে।

জয় হঠাৎ বলে উঠলো, এর নাম একতা।

ঠিক তাই। ব্যাংগমা বললো। একতা। এ নইলে কোনো গুণই কাজে লাগে না।

তখন? তখন কী হলো?

তখন রাজকন্যা করল কি, একদিন ওর ঘুমের ছোঁয়া ছুঁইয়ে তীরন্দাজকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। তারপর সায়েব, নিখুঁতি, জিতকুমার মীনকুমারকেও, একে একে। রাজকন্যার মহল ছিলো প্রকাণ্ড। সেই মহলের এক ঘরে পুরে রাখলো ওদের। কেউ জানলো না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দীপকুমার একদম একা হয়ে গেল।

দীপকুমার বললো, তাহলে আমাকেও ঘুম পাড়িয়ে দাও, রাজকন্যা।

রাজকন্যা চালাকি হাসলো মুখটিপে। তারপর বললো, না। তোমার কি ঘুমোনো চলে? আমি কার সংগে গল্প করবো তাহলে?

কেন, তোমার সখীরা?

সখীরা কলকল করে হেসে উঠলো।

রাজকুমারীও কলকল করে হেসে উঠলো।

তারপর বললো, এই তোমার ঘর। বলে পাশের ঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলো।

তাহলে? জয় বললো, দীপকুমারের তো বড়ো বিপদ।

ব্যাংগমী বললো, সে তো ঘুড়িবুড়ো গোড়াতেই বলেছিলো। বলেনি? সেই বিপদ থেকে দীপদের বাঁচাতেই তো ঘুড়িবুড়োর সামপানে বেরোনো, ভুলে গেলে?

তাই তো!

দিন যায়। দিন যায়। এমনি করে দিন যায়।

এক মহলে ঘুমিয়ে আছে তীরন্দাজ। সায়েব। জিতকুমার। মীনকুমার। নিখুঁতি।

অন্য মহলে এ খবর কেউ জানেনা।

মহলের অন্য আরেক ঘরে দীপকুমার।

রাজকন্যা আসে সখীদের নিয়ে সেখানে। নানা গল্প, এ-কথা ও-কথা। কিন্তু গল্প জমে না। দীপকুমারের মন পড়ে থাকে ওর

বন্ধুদের কাছে অন্য ঘরে। সেখানে তার যাবারও উপায় নেই। তীরন্দাজ তো ঘুমিয়ে আছে, কে ওকে এখন নিত্যিনতুন সাজে সাজাবে ?

দীপকুমার ভাবে। ভাবতে ভাবতে দিন যায়।

রাজকন্যাও ভাবে। বলে, আজ রাতে ময়ূরপঙ্খী করে বেড়াতে বেরোবো।

ভোজপুরীদের বলেছি, ওরা কিছু বলবে না।

দীপকুমার বলে, বেশ।

বলে, কিন্তু মন পড়ে থাকে বন্ধুদের কাছে।

রাজকন্যা আসে। আবার চলে যায় সখীদের নিয়ে।

সখীরা বলে, এইবার দুমড়ে এসেছে। চিরকাল কি ঘোড়ার কথা কেউ মনে রাখে ?

রাখে না। এইবার দেখো দেখো দীপকুমার ভুলে যাবে।

কিন্তু দীপকুমার ভোলে না।

আর কেবলই ভাবে। ভেবে ভেবে কোনো কিনারা পায় না।

মন খারাপ করে একদিন ভোরে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। আকাশে ভোরের আলো হালকা হয়ে ফুটছে।

জানলার বাইরে একটা পেয়ারা গাছ। তাতে দুটো পাখি।

পাখি ?

হ্যাঁ, ওরা নিজের মনে কথা বলছে।

দীপকুমার কান পেতে থাকে। ও তো পাখিদের ভাষা বোঝে।

একটি পাখি বলছে, দীপকুমারের বড়ো বিপদ।

হ্যাঁ। অন্যটি বললো, কিন্তু এর কি কোনো উপায় নেই ?

থাকবেনা কেন ? কিন্তু সে তো বিরাট শক্ত ব্যাপার। দীপ কি তা পারবে ?

পারবে না ?

না। রাজকন্যার হাতের জিয়নকাঠি নইলে তো জিতকুমারদের ঘুম ভাঙানো যাবে না। আর সে তো ওদের ঘুম ভাঙাবেও না। আর

সবাইকে জাগালেও তীরন্দাজকে তো কখনোই না। সে যে বহুরূপীর মন্ত্র জানে! তাই।

তাহলে?

তাই তো! বলে পাখিটি গুম মেরে থাকে।

দীপ কান খাড়া করে শোনে।

অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই। তারপর এক সময় পাখিটি বললো, তবে পরীর দেশের ঘুমপরী জানে ঘুম ভাঙানী মন্ত্র।

দীপ তখন ওদের ডেকে বললো, শোনো, ও ভাই, শোনো একটু এদিকে—

পাখিরা চার দিক তাকিয়ে দেখে, আরে, দীপ যে ওদের ডাকছে!

তাই দেখে ওরা উড়ে এলো জানালার গরাদে। ভুলেই গিসলুম তুমি যে আমাদের ভাষা জানো!

ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি।

দীপ বললো, দেখছো তো, আমাকে আটকে রেখেছে এ-ঘরে। কোনো উপায় নেই বেরোবার। তোমরা আমার বন্ধু, একটা উপকার করবে?

কী উপকার?

বলছি। বলেই দরজায় ভালো করে শেকল এঁটে দিয়ে এলো। নইলে কে কখন হুট করে এসে পড়বে। বলা তো যায় না!

দীপ বললে, সাত সাগর আর তেরো নদী পেরিয়ে একটা তেপান্তরের মাঠ।

তারপর সেই মাঠের শেষে একটা বন, বন পেরিয়ে সাগর। তার মধ্যে নানারঙের পাখি-পাখালির একটা দ্বীপ। সে-দ্বীপের মধ্যে সুগন্ধী ঝর্ণা আর আকাশ-গংগার আলো।

আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এইটেই তো আকাশ-গংগার দ্বীপ, পাখি-পাখালির?

সেখানে, যেখানে সাগরের নীল জল নিঃশব্দে এসে মিশেছে দ্বীপের আঙিনায়, সেখানে আছে হিজল-রঙ ফুলের এক আশ্চর্য গাছ।

সেই গাছে থাকে আমার দুজন বন্ধু, ব্যাংগমা আর ব্যাংগমী।

সেখানে গিয়ে তুমি যদি আমার কথা বলো, যদি বলো আমাদের কী বিপদ, তাহলে ওরা ডেকে আনবে আমাদের আর এক বন্ধুকে—সাদা দাড়ি, সাদা চুল হাওয়ায় উড়ছে—সেই রূপকথার রাজাকে। তখন—

ঘুড়িবুড়ো হো হো করে হেসে উঠলো।

বললো, রাজা না ভজা!

ব্যাংগমা বললো, একনম্বরের কুঁড়ে কোথাকার!

আজ কতদূর অবধি গিয়েছিলে হে? ব্যাংগমী ঘুড়িবুড়োকে শুধোলো।

বললুম-না, প্রায় ছুঁই ছুঁই। সোনা গুহার চূড়া ঝিকিয়ে উঠলো-না রোদে? বলিনি?

সে তো হলো। তারপর? ব্যাংগমীর আর যেন তর সয়না। ঘুড়িবুড়ো পৌঁছুবে গিয়ে স্তবনশিরির রাজকন্যাদের সোনা গুহায়। তারপর খুঁজে বের করবে দীপকুমার আর তার বন্ধু—জিতকুমার মীনকুমার আর তীরন্দাজদের।

তীরন্দাজকে না জাগালে তো আসল মজাটাই মাটি। হারিয়ে যাওয়ার জাদুটাই যে ওর!

সে সব কবে হবে? অ্যা? ব্যাংগমীর আর তর সয় না।

কেন জানো?

গল্প নইলে ওর যে চলে না! আর ওরা জেগে উঠলে তবেই না আবার নতুন গল্প? ঘুড়িবুড়োকে ও ভীষণ তাড়া লাগায়।

ঘুড়িবুড়ো বললো, যাচ্ছি তো রোজ রোজ সাড়ে তিন ঘণ্টা করে। প্রায় সেরে এনেছি—

জয় বললো, ওই টুকুনটি গেলে কি হয় কখনো? আর গিয়ে তো আবার ফিরে আসছো এখানে। তাহলে আর গেলে কোথায়?

আমিও ঠিক বুঝতে পারলুম না। বললুম, এগিয়ে গেলে তো এগিয়েই থাকবে। ফিরে এলে তো সেই ফের কেঁচে গণ্ডুষ!

এইকথা শুনে সবাই ওরা হেসে উঠলো।

ঘুড়িবুড়োর হাসিতে সারা দ্বীপ নড়ে উঠলো। বাংগমা-ব্যাংগমীও টুকটুকিয়ে হাসতে থাকলো। আমরা দারুণ ঘাবড়ে গেলুম। এতে আবার ভুল হলো নাকি হিসেবে?

ব্যাংগমা বললো, রূপকথার দেশে কেউ এগিয়ে গেলে কেবল এগিয়েই থাকে। ঘুড়িবুড়ো যতোখানি যায়, পরদিন সেখানে থেকে সুরু করে। নামতার মতো। আজ যদি তিপ্পান্ন পর্যন্ত, কাল যখন সুরু করবে তখন কি আবার এক থেকে? না। চুয়ান্ন থেকে। সেই রকম।

কিন্তু, জয় বললো, সে না হয় হলো।

হলো? ঘুড়িবুড়ো আবার হাসতে লাগলো। হলো আর কই। হলো না। পরীর দেশ থেকে ঘুমপরীকে যে আনলুম—

অ্যাঁ? ঘুমপরী? কোথায় সে?

ওমা, তাও দেখোনি? ব্যাংগমী বললো, ওই দেখো। ওই—

দেখি আমরা যে-নয়নতারার পাশে ঘন হয়ে বসেছি, তার ওপর বসে আছে টুকচি একটি প্রজাপতি!

ঘুমপরী। আলতো রঙ। যেন স্বপ্নে ডুবে আছে।

ব্যাংগমা খেই ধরিয়ে দেয় ঘুড়িবুড়োর। ঘুমপরীকে যে আনলে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—হঠাৎ যেন সব মনে পড়ে গেলো, বললো, সেই ঘুমপরীই এখন ঘুমে ভাসছে! হতচ্ছাড়ী মেয়ে, নিজেই ঘুমিয়ে সারা, অন্যের ঘুম ভাঙাবে কী?

তিনভুবনের সকলের ঘুম ভাঙিয়ে আর ঘুম পাড়িয়ে বেচারা

এমনিতেই হন্তদন্ত। এই একটিপ ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। তুমি আর বাগড়া দিও না বাবু। বেশ! ঘুমোক। আর এখন জেগে বসেই বা ও করবে কী? সোনাগুহা পৌছুতে এখনো দু-দশমিনিট লাগবে কোন্-না! বলে মুখটিপে হাসলো একটু ঘুড়িবুড়ো।

ঘুড়িবুড়োর কথার ভংগিই এই। না-হেসে পারে কার সাধ্যি!

জয় বললো, সে কি অনেক দূর, ব্যাংগমী? সেই সুবর্ণশিরির সোনাগুহা?

ব্যাংগমী বললো, দূর বললে দূর, কাছে বললে কাছে। রূপকথার দেশে দূর বলেও কিছু নেই, কাছে বলেও কিছু নেই। আবার দূর-নিকট দুই-ই আছে! কাছাকাছি। কানামাছি।

আমি বললুম, সব মনের, না?

ঠিক তাই। বলে হঠাৎ ব্যাংগমা ডানা ঝটপটিয়ে সরে বসলো ব্যাংগমীর পাশে নয়নতারা গাছের তলায়।

আর, ঠিক তখুনি, বর্ষার দিনে আকাশে যেমন বিদ্যুৎ চমকায় সেইরকম একটা আলোয় চমকে উঠলো মহুয়া গাছের তলাটা।

কী ব্যাপার?

দেখি নয়নতারা গাছে বসে-থাকা ঘুমপরীও নেই, আর, কী অবাক কাণ্ড, ঘুড়িবুড়োই বা কোথায়? অতো প্রকাণ্ড জলজ্যান্ত মানুষখানা?

আমরা ড্যাব-ড্যাব করে চারদিকে খুঁজছি, কেবলই খুঁজছি, দেখে ব্যাংগমী বললো, খুঁজছো কাকে? ঘুড়িবুড়ো আর তোমাদের ঘুম-পরীকে? ওই দেখো—

দেখি মহুয়াগাছের অগ্নিকোণে একটা বেতবন।

সেখানে ঝকঝকে উজ্জ্বল রঙ ধরেছে সূর্যের আলোর। যেন সোনালী হলুদ। সেই সোনালী-হলুদ আলোয় দেখি নীল সবুজের ঢেউ ভেঙে ঘুড়িবুড়োর সামপান ভিড়ছে সোনাগুহার ঘাটে। সেখানে নানারঙের কাজ-করা বিরাট একটা বজরা বাঁধা।

জয় চুপি চুপি বললো, ময়ূরপঙ্খী নাও।

আমরা দম বন্ধ করে দেখতে লাগলুম। দুপাশে দাঁড়গুলো হেলে পড়ে আছে। রামধনুরঙের পালগুলো গুটিয়ে আছে মস্ত মাস্তুলের কাছে কাছে! নৌকোর মুখে প্রকাণ্ড একটা ময়ূর। তার শরীর থেকে নীল বিদ্যুৎ যেন ঠিকরে পড়ছে। নীল, সাদা, সবুজ, বেগনী, কমলা, লাল বিদ্যুৎ ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, আর সাগরের জল রঙিন হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

সেই আলোর মেলায় ঘুড়িবুড়োকে দেখলুম। তার রেশমের পোষাকে রঙ উড়ছে আবীরের গুঁড়োর মতো। ঘুমপরী বসে আছে তার কাঁধে।

ঘুড়িবুড়োর সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে।

সাদা কোথায়? জয় চেঁচিয়ে উঠলো। সাদা, লাল, সবুজ—

হ্যাঁ, ময়ূর যখন যেমন রঙ ছড়াচ্ছে, তখন তেমনি রঙে ঘুড়িবুড়োর দাড়িও রঙিন হয়ে উঠছে!

যেন, কী যেন বলছিলো ঘুড়িবুড়ো? ব্যাংগমী বললো। রামধনুকের ফুলঝুরি।

সার্কাসের সেই ফুলঝুরিতে এখন ও নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছে যে!

ডাঙায় উঠতেই ভোজপুরী দারোয়ানরা হৈ হৈ করে এলো।

কে হে তুমি? জিজ্ঞেস করলো হেড দারোয়ান।

ঘুড়িবুড়ো ওর কানে কানে কী যেন বললো, হাওয়ার শব্দে শোনা গেলো না।

দারোয়ান খুশমেজাজে অট্টহাসি হেসে ঘুড়িবুড়োকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, বললো, আরে রামজী, এতোদিন কোথা ছিলে?

তারপর অনেক পুরোনো দিনের কথাবার্তা। কিছু তার ঝাপসা, কিছু তার চকচকে।

বন্ধু নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ব্যাংগমা বললো, ঘুড়িবুড়োর কে-যে বন্ধু নয়!

দারোয়ান বললো, ওই যে দেখছো চীনার গাছ চারটে একসংগে ঝোপ বেঁধে আছে, তার পাশ দিয়ে মোরাম ঢালা রাস্তা। সেইটে ধরে সোজা এগিয়ে যাও দক্ষিণে। সেখানে গিয়ে পাবে ছোট্টো একটা পুকুর, তাতে শালুকফুল ছড়ানো। তার সামনে রাজকন্যার মহল। নীল রঙের দেয়াল, সাদা থাম। আর মাথার ওপর সোনার গম্বুজ।

ঘুড়িবুড়ো বললো, সে তো বুঝলুন! কিন্তু সে মহল তো আর একটুখানি না, তাতে কতো কোঠা দালান। কতো বারান্দা। কতো ব্যালকনি। কতো বসার ঘর! না? রাজকন্যার মহল বললেই তো আর হলো না। দীপকুমার আছে কোথায়, জিত আর মীন, আর সেই ঘোড়া তিনটে—

ঘুড়িবুড়োর কথা শেষ হলো না।

দারোয়ান চেঁচিয়ে উঠলো। খলবল করে ভোজপুরী ভাষায় কী সব বলে গেলো।

কী?

না, সেই ঘোড়া তিনটে।

হ্যাঁ। কোথায় ওরা?

দারোয়ান বললো, ছিলো। কিন্তু এখন তো ওরা নেই! অনেক অনেক দিন হলো ওরা নেই।

যেন আশ্চর্য একটা খবর শুনলো ও। শুনে দুঃখে ভরে গেলো।

কোথায় গেলো? শুকনো মুখে ঘুড়িবুড়ো বললো।

তা তো জানি নে, কিন্তু এদিক দিয়ে যে নয়, তা হলফ করে বলবো!

ঘুড়িবুড়ো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঘুমপরী বাধা দিয়ে বললো, এ বেচারা জানবে কী করে বলো তো, তোমারও যেমন!

ওঃ হো, তাইতো! ওরা তো সবাই ঘুমে অচেতন।

অচেতন? হায় হায় করে উঠলো হেড দারোয়ান! এ কেমন কথা?

হ্যাঁ, তোমাদের রাজকন্যা তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তার মহলে।

তাই নাকি? সে তো মহা মুশকিল হলো তাহলে!

মুশকিল বলে মুশকিল! সে যাক—দেখি গে একটু খুঁজে টুজে!

বলে ঘুড়িবুড়ো আর ঘুমপরী চারচীনারের পথে এগোলো।

দারোয়ান কী করবে কী বলবে ভেবে না পেয়ে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গালে হাত রেখে।

শালুক পুকুর নাগাদ গিয়ে ওরা দেখলো দুচারজন কারা এদিক ওদিক আসছে যাচ্ছে। এখান থেকেই কালো পিচঢালা আরো তিনটে রাস্তা তিনদিকে চলে গিয়েছে। রাজকন্যার নীলমহল দেখা যাচ্ছে। কাছেই।

ঘুড়িবুড়ো বললো, কেউ তো কিছু বলছে না। অচেনা মানুষ যে!

ঘুমপরী বললো, বলবে আবার কী? হেড দারোয়ান যাকে ঢুকতে দেবে সে তো বাইরের মানুষ থাকে না। সে যে আর অচেনা থাকে না। তাছাড়া—

ওকে একটু আনমনা দেখালো, বললো, তাছাড়া আজ তো ওদের কাজের দিন। অফিস-টফিস সব খোলা।

একটু ক্ষণের মধ্যেই ওরা রাজকন্যার মহলে ঢুকে পড়লো।

নীল দেয়াল, সাদা থাম, সোনালী গম্বুজ। দারোয়ান যেমন বলেছিলো। আর মেঝেতে আলপনার সাজ।

ঠিক যেমন বারান্দায় পা দিয়েছে অমনি তিনটি মেয়ে একটা ঘর থেকে কলতান করে হাসতে হাসতে বেরোলো। ঘুমপরীরা চট করে থামের আড়ালে লুকোলো।

একজন বললো, রাজকন্যা, দীপকুমারকে যে বড্ডো হাসিখুশী লাগলো আজ?

রাজকন্যা বললো, ও বন্ধুদের কথা জানতে চেয়েছিলো। তা, আমি বললুম, ওরা তো ভালোই আছে। ঘুমিয়ে। তুমি ভেবো

না, ওরা ভালোই আছে ওই তেকোণা হল ঘরটায় যার দরজায় রাজমুকুট আঁকা।

ও। তা বেশ, বললো দীপ। অমন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা, তাই বা মন্দ কী!

সখীরা তখন হাসতে হাসতে অন্যদিকে চলে গেলো।

ঘুড়িবুড়ো বললো, শুনলে? রাজমুকুট আঁকা?

ওসব শুনে আমার কাজ নেই। ওরা কোন ঘরে আছে সে তো আমি জানিই। এই দেখো।

বলে ঘুমপরী ঘুড়িবুড়োকে একটা আঙুল উপুড় করে দেখালো।

কে কোথায়.ঘুমোয় সে তো আমাকে জানতেই হয়। সেই তো আমার কাজ, তাই না?

তখন ওরা দুমিনিটের মধ্যেই তেকোণা হলে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে তীরন্দাজ আর সায়েব আর নিখুঁতি, জিতকুমার আর মীন-কুমার ঘুমিয়ে আছে, ঘুমপরী উড়ে উড়ে ওদের গালে আদর করতেই ওরা সবাই ঝুপ করে জেগে উঠলো। আর জেগে উঠে যেই সায়েব চিঁ-হিহি করতে যাবে অমনি ঘুমপরী মুখে আঙুল রেখে ইশারায় বললো, চুপ।

জিতকুমার এক সেকেণ্ডে অঁাক কষেই বুঝলো, সব রাজকন্যার কাণ্ড। তারপর শুধোলো, কী ব্যাপার, দীপ কোথায়?

ঘুড়িবুড়ো বললো, তাই তো! তা বাপু, একটুখানি হিসেব করে দেখো না কেন?

তীরন্দাজ এক পলকে সবাইকে একঝাঁক প্রজাপতি বানিয়ে দীপকুমারের ঘরে নিয়ে চললো।

দীপকুমার উদাস হয়ে জানালায় চেয়ে আছে। আর কার্নিশে বসা পাখিদের সংগে পাখির ভাষায় কথা বছে।

একটি পাখি বললো কথা থামিয়ে, ওই দেখো, পেছনে।

শুনে, যেই না দীপ পেছনে তাকিয়েছে, অমনি ওরা সবাই

যে-যার আসল চেহারায় ফিরে এলো। ওরা সবাই হুল্লোড় করে উঠলো।

তীরন্দাজ দীপকুমারের কাছে গিয়ে ওকে আদর করলো।

পাখিদের ধন্যবাদ দিয়ে ঘুড়িবুড়ো বললো, এবার তোমাদের ছুটি। তোমরা যে দীপদের বিপদের কথা আমাদের জানিয়েছিলে আর এতোদিন ওর সংগে গপ্পোসপ্পো করে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে সেজন্যে ধন্যবাদ।

দীপ ওদের ভাষায় ওদের বললো, আবার দেখা হবে। মেলায়। যেয়ো। আবার দেখা হবে।

এই বলে ওরা সবাই প্রথমেই গেলো রাজকন্যার ঘরে।

রাজকন্যা তো ওদের সবাইকে একসংগে দেখে অবাক।

সখীরা ভাবলো, আর রক্ষে নেই। এখন উপায়?

কী? ঘুড়িবুড়ো বললো, চিনতে পারো?

ওমা, তুমি! এতোকাল বাদে মনে পড়লো?

বলে রাজকন্যা ঝুম করে ঘুড়িবুড়োর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ঘুমপরীও মনে হলো ওকে চেনে। ঘুমপরী এগিয়ে গিয়ে সখী দুজনকে বললো, কী, চিনতে পারো? বলে ওদের গালে আদর করলো।

ওরা খুশীতে ডগোমগো হয়ে ঘুমপরী আর ঘুড়িবুড়োকে জড়িয়ে ধরলো।

জিতকুমাররা ওদের কিন্তু চেনে না।

ঘুড়িবুড়ো হেঁয়ালি করে বললো, এবার চলো তো রাজামশাইকে একটু দেখে যাই।

রাজকন্যা বললো, উনি তো সভা করছেন।

সভার ভেতরে যাওয়াটা কি ভালো হবে? রাজা বলে কথা! সরকারী কাজ! রাজা বলে কথা!

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, ওরা সবাই রাজার মহলেই এসে উপস্থিত !

সোনার পথ, সোনার বাড়ি। চারদিকে ঝকঝকে সূর্যের আলো। চোখ চেয়ে তাকানো যায় না।

আমি ব্যাংগমীকে বললুম, ঘুড়িবুড়ো আর ঘুমপরী তো রাজকন্যাদের চেনে। কী ব্যাপার, ব্যাংগমী ?

ব্যাংগমী বললো, সে আরেক গল্প। বলবো'খন আরেক দিন। আসলে ও তো রাজকন্যাও নয়, রাজকন্যা সেজে আছে শুধু।

আর ওর বন্ধুরা ?

ওরা সবাই ছেলেবেলার বন্ধু। দীপরাও ওদের ছেলেবেলার বন্ধু।

সত্যি ?

রাজামশাই বিরাট সিংহাসনে বসে মন্ত্রীদের বক্তৃতা শুনছিলেন।

বক্তৃতা তো কতো, কেবল এই করলে সেই হয়, সেই হলে এই হয়,—এইসব তর্ক আর কূটকচালি। রাজামশাই আদ্ধেক শোনেন, আদ্ধেক বোঝেন, বাকি আদ্ধেক বোঝেনও না শোনেনও না। এইভাবে চিরকাল সভা হয়ে আসছে।

ঘুড়িবুড়ো বললো, বাব্বাঃ, ভুঁড়িটা তো আরো বেড়েছে দেখছি! রাজকন্যা, তুমি কি ওকে বলোনি যে ভুঁড়ি হওয়াটা প্রচণ্ড খারাপ ?

এঃ, তুমি আবার হাসছো ? নিজের ভুঁড়িখানার কী বহর, দেখেছো ?

কাছে যেতেই রাজা মশাই সিংহাসন ছেড়ে উঠে বললেন, আরে, এসো, এসো, এই যে মন্ত্রীমশাইরা, ওঁরা এসে গেছেন—বলেছিলুম না এনারা আসবেন আজ ?

ও, আগেভাগেই বলা হয়ে গেছে? বলে খুড়িবুড়ো আর রাজামশাই দুজন-দুজনকে চেনা বন্ধুর মতো বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

জয় বললো, রাজামশাইও খুড়িবুড়োর চেনা? কী ব্যাপার ব্যাংগমী?

ব্যাংগমী রাজসভার মধ্যে চেয়ে চেয়েই বললো, বাঃ, চেনা হবে না, কতোকালের চেনা!

চিরকালের চেনা। চিরদিনের চেনা।

কী করে, কী করে? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলুম। বলো না, ব্যাংগমী।

ব্যাংগমী বললো, সে আরেক লম্বা কথা। বলবো'খন আরেকদিন।

রাজামশাই দীপকুমাদের আর তাদের ঘোড়াদের আদর করে বললেন, এবার সবাই খুশী তো?

তীরন্দাজ চিঁ-হিহি করে উঠলো।

সায়েব-নিখুঁতিও চিঁ-হিহিহি করে উঠলো।

রাজকন্যারা খুশীতে ঝলমল করছে! রাজামশাই বললেন, আর কিন্তু কাউকে ঘুম পাড়াতে পারবে না।

আমি চাইও না! বললো রাজকুমারী। এসব তো ঘুমপরীর কাজ। ও-ই করুক না।

রাজামশাই খুড়িবুড়োকে বললেন, যাবার মুখে আমাদের হেড়ুকে দেখে যেয়ো একটু। বেচারা! আমার ভুঁড়িতে লাঠি মারা অবধি আর ঘোড়া দেখা অবধি কেমন যে মনমরা হয়ে আছে! আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর সংগে তো তোমার গোড়াতেই দেখা হয়ে গিয়েছে!

খুড়িবুড়ো বললো, আবার দেখা হবে। যেয়ো মেলায়। সবাই।

দেখা হবে। দেখা হবে। দেখা হবে।

কেউ কাউকে চেনে না, আবার সবাই সবাইকে চেনে, রূপকথার দেশের এই মজা!

বলতেই দেখি হঠাৎ ওরা সবাই সেই সার্কাসের আলোঝলমল ফুলঝুরির ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে এসে গিয়েছে। ওদের সবার আলোঝলমল পোষাক থেকে রামধনুর রঙ ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। রাজকন্যাদের মতো ঘুমপরীও সেজেছে জরির পোষাকে।

আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো।

জয় আর আমি—আমরা দুজনই ঝালাপালা আলো থেকে চোখ বাঁচাতে একপলক চোখ বুজে ফেললুম।

তারপর চোখ খুলতেই দেখি আমরা আগের জায়গাতেই বসে আছি। খাবারের কাগজগুলো কাছেই পড়ে আছে। ঘুড়িবুড়ো বললো, এতে অতো ভাববার কী আছে?

কী? ভাববার?

ঐ যে বললে তোমাদের কেন অমন হয় না—সবখানেই বাড়ি, যেখানেই থাকো, সেখানেই বাড়িঘর? ইচ্ছে করলেই হয়। ইচ্ছে করলে তবে তো হবে? নাকি? আর তখন তো হয়ই হয়—যখন পরীর দেশের ভাইবোন ফুল সংগে থাকে। দেখো। এবার দেখো, ঠিক বলছি কি-না!

বলতে বলতে হঠাৎ চোখের সামনে ঘুড়ির দোকান ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলো। আকাশে এক ঝাঁক পাতিহাঁস লাইন বেঁধে উড়ে গেলো।

বাতাসে কেয়া ফুলের গন্ধ।

জয় বললো, ওই দেখো, যেমন স্বপ্নে দেখি-না, সেই রকম।

দেখি একটি নদী।

তার পাশে কেয়াবন ঝোপ বেঁধে আছে। আর সারে সার সেই

নদীতে চলছে পাল তোলা নৌকো। কোনোটা সাদা, কোনোটা নীল, জাফরান, কোনোটা ঝিঙেফুল হলুদ। তাতে প্রজাপতি পরীরা ভাসছে। বেড়াচ্ছে। হাসছে। গাইছে।

হাওয়ায় কেয়া ফুলের গন্ধ ভারি হয়ে এলো।

আমাদের চোখে ঘুমপরী এসে বসলো।

একসময়। নিঃশব্দে।

ওর পায়ের নূপুর ঘুমপাড়ানীর সুরে বেজে মাধবীলতার মালা হয়ে দুলে রইলো আমাদের বুকে।...

হীরেমানিকের বড়ো লাইনে গাড়ি বদলে আমরা এসেছিলুম সোনানূপুর।

যেমন আমাদের কোলকাতা। সেই রকম।

বিরাট একটা সোনার নূপুর। এই ওদের শহর।

শহর বলতে শহর। আবার গাঁ বলতে গাঁ।

কী রকম? কী রকম? তাই কি আবার হয়?

হয়। যেমন সোনানূপুর। পরীর দেশের বড়ো শহর। আমাদের যেমন কোলকাতা। ওখানে আছে ফুলের বাগান আর কতো রকম পাখিদের বাসা। সেও একরকম বাগানই তো। কতো পাখি কতো রঙ। যেন কেয়ারিতে কেয়ারিতে মরশুমী ফুল ফুটে আছে!

এইখানে এক ফলসা গাছ, বাঁধানো পুকুরের ঘাটলায়।

সেই ফলসা ফুলে পরীদের রাণী পা ছড়িয়ে বসে আছে। গায়ে তার কদম ফুলের গন্ধ, গলায় বেলগোড়ের মালা।

আমাদের দেখতে পেয়ে বললো, কী, ঘুম হলো?

আমরা হেসে ফেললুম। অতো কথা থাকতে শেষে কি-না ঘুম হলো? যাঃ। বললুম, ওখান থেকে বুঝি সব দেখা যায়? তাই বসে আছো অতো উঁচু গাছের ফুলে?

রাণী বললো, সব দেখার কী দরকার? যা দেখা যায় তা-ই তো ঢের, ঠিক মতন দেখতে পারলে। দেখলে।

রাণীদের কি আর সব দেখতে হয়? ছিছি, বড্ডো ভুল হয়ে গেছে!

পরীর রাণী মিষ্টি হেসে বললো, তোমাদের দেখছিলুম। কী সুন্দর যে ঘুমিয়ে পড়লে জিরি নদীর পাশে, কেয়াবনে। দেখছিলুম।

সে তো অনেক দূর। কী করে দেখলে?

দেখলুম আর কি। ইচ্ছে হলো, তাই।

জয় আতস কাঁচটি এবার পকেট থেকে বের করে রাণীকে দিলো। বললো, এই নাও, তোমাকে দিলুম। আমাদের দেশের জিনিস।

রাণী হেসে উঠলো। তারপর হাতে করে আতস কাঁচটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বেশ তারিফ-তারিফ সুরে বললো, বাঃ, ভারি সুন্দর তো! এসব ওরা মাথা খাটিয়ে বের করেছে। ছোটোকে কেমন বড়ো করে দেখায়। বাঃ—

তারপর গালে ছুঁইয়ে জয়ের হাতে ফেরৎ দিলো।

বললো, আমার নেয়া হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে সবাইকে দেখিয়ো। এটা দিয়ে এখন অনেক রকম দেখতে পাবে। হরেক হরেক রকম, অনেক, আরো অনেক রকম। দূরের জিনিসকে কাছে পাবে, যা-আছে মনে মনে, তা-ও। এমন কি, যা নেই কিন্তু কোনোদিন হলেও হবে, তা-ও।

তারপর একটু থেমে বললো, মানুষের চোখে তো ভাইবোন ফুল নেই, তাই, আহা, ওরা কতো কিছুই তো দেখতে পায় না!

তাই নাকি?

আমরা দুজন অবাক হয়ে যেই না চেয়ে দেখলুম, অমনি আতস কাঁচে নানা রকম ছবি ভেসে উঠলো।

কী অবাক কাণ্ড!

পরীর রাণী আপন মনে হাসতে থাকলো মিটিমিটি।

কী করে হলো!

পরীর রাণী হেসে উঠলো। এতে আমার একটুখানি ভালোবাসা মিশিয়ে দিয়েছি। এই যা। বুদ্ধির জিনিসটা তো তোমাদের ছিলোই। আমি একটু ভালোবাসা ছুঁইয়ে দিলুম, যা-থাকে আমাদের চোখে আর বুকে। ভালোবাসার মিষ্টি রঙ!

জয় আতসকাঁচে আবার চোখ রাখলো।

কিন্তু কই, ছোটো জিনিসকে তো আর বড়ো দেখাচ্ছে না! জয়ের মন দারুণ খারাপ হয়ে গেলো।

রাণী বললো, ছোটো জিনিসকে মিছিমিছি সব সময় বড়ো করে কী লাভ? ছোটো তো ছোটোই ভালো। তাই না?

যাঃ, কী বলছো যা-তা। আমি বললুম।

পরীর রাণী আবার হেসে উঠলো। বললো, যা-তা বুঝি? না, যা-তা নয়। এই যে তোমরা ছোটো, তোমাদের তো তা-ই দেখছি। এক্ষুনি যদি তোমাদের চুল পেকে দাঁত পড়ে সব থুথ্‌থুড়ে হয়ে যায় তাহলে কেমন হবে? ভালো লাগবে না তো, তাই।

জয় তবু মন খারাপ করে থাকলো। বললো, আমার বাপী এটা দিয়ে ডাক্তারী বই পড়তো। কেমিস্ট্রি পড়তো।

রাণী বললো, এবার থেকে দেখো আরো কতো কী সব পড়তে পারবে। শুধু শুধু ডাক্তারী বই পড়ে কী লাভ? শুধু শুধু কেমিস্ট্রি পড়ে কী লাভ? এক টুকরো হয়ে থেকে কী হবে। পুরোটি তো হতে হবে, তাই না? মন খারাপ করো না।

এমন সময় পশ্চিমের সমস্ত আকাশখানি জুড়ে মস্ত একটা রামধনু উঠলো। রামধনুর রঙ আমাদের জামা কাপড়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

ইস, কী মস্ত রামধনু, পরিস্কার সাতটা রঙ। দেখ দেখ। ইস, দেখ দেখ। জয়কে বললুম।

রাণী বললো, বেনীআসহকলা। বলে হেসেই কুটিকুটি।

আমরাও হাসতে লাগলুম।

তারপর রাণী আমাদের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে বললো, জানো, কী করে রামধনু হয় ?

জয় আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে শেষে বললুম, কোনো পরীর কাণ্ড নিশ্চয়ই। পরীর দেশে এ-ছাড়া আর কী হবে ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। রাণী বললো। সে এক আশ্চর্য পরী—এই দেখো।

যেই না বলা, অমনি দেখি আরেকটা ফুলে উড়ে এসে বসলো নতুন একটা প্রজাপতি। তার ডানা দুটোয় অবিকল সেই রামধনুটি ফুটে রয়েছে—কাঁপছে থরথর করে, পাপড়ির মতো।

রাণী বললো, এই হলো রামধনু পরী যার খেলা মেঘে আর রোদে। বৃষ্টির রেণুতে আর রোদের কণাতে।

আমরা অবাক হয়ে রাণীর দিকে তাকালুম।

কী রকম ?

রাণী বললো, বৃষ্টির খুব ছোটো ঝিরঝিরে ফোঁটার ভেতর দিয়ে রোদ যখন খেলে যায়, তখুনি এমনি হয়। রোদের সাদা ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

রোদের সাদায় অতো রঙ ? কী আশ্চর্য !

হ্যঁা। ওই হলো রামধনু। আর ইন্দ্রধনু। আর এই সাতটাই তো মোটে রঙ। অন্য সব তো এও তা মেশানো।

রামধনু পরী বললো, যেমন স্বপ্নে মেশে না, সেইরকম। অ্যাঞ্জেল মাছের গায়ে যেমন। কি পাতাবাহারের পাতায়—

দেখোনি ? কতো রকম সবুজ। নীলই বা কতো! লালই বা কতো !

রাণী বললো, এই এক ফোঁটা সাদা থেকে কতো রকম হয়ে গেলো, দেখলে ?

সাদা হলে কী হয়। সূর্যের রঙ তো, তাই।

লক্ষ্মণ দাদাও তাই বলছিলো একদিন।

সূর্যের মধ্যে যতো আলো ততো আর নেই কোথাও।

আর সূর্য আছে বলেই সব আছে। গাছপালা, ফুলফল, পোকা-মাকড়, ব্যাঙ হাতি তিমি ক্যাঙারু। এমনকি বৃষ্টি। নদী। পুকুর। সমুদ্র। সব সব।

নইলে?

নইলে আবার কী?

সব অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর কেবল হাবারামের মতন হাতড়ে হাতড়ে বেড়ানো!

যাঃ। আলো না থাকলে কি মজা হয়?···

মজার কথা উঠতেই লক্ষ্মণদাদা আবার ফিকফিকিয়ে হেসে উঠলো।

বললো, সেই যে চীনেম্যানটা পাড়ায় পাড়ায় কাপড়ের ঝোলা কাঁধে ঘুরতো ওর ফুটফুটে গোলগাল মেয়েটির হাত ধরে, মনে নেই?

কাপ্‌লা—ওলা, কাপ্‌লা—ওলা বলে হাঁক দিতো দুপুরে দুপুরে।

হ্যাঁ, সে তো সেই কবে না কবে। যার ঠাকুদ্দা হংকং থেকে এসে কোলকাতায় ঘর বেঁধেছিলো!

হ্যাঁ। ড় বলতে পারে না, র-ও বলতে পারে না। বলে ল। রেইন-কে বলে লেইন, রাইস-কে বলে লাইস।

লাইস? সে তো উঁকুন!

উঃ! লাইস! আর কক্ষনো বলবে না মজা, বলবে মাজা। উফ্‌!

সেই চীনেম্যানের গল্প বলছিলো একদিন লক্ষ্মণদাদা।

জয় বললো, মনে নেই লক্ষ্মণদাদা, সেই যে গেলোবার পূজোয় এসেছিলো এক মিশরী। ইয়া লম্বা জোব্বা গায়ে, টিকোলো নাক, কুঁচোকুঁচো গুঁড়িগুঁড়ি চুল? মনে নেই? ওদের ভাষায় প-ই নাকি নেই! কী কাণ্ড!

আমার ভীষণ হাসি পেতো। ও বলতো, বদ্মবুকুর। প বলতে পারে না, বলে ব। কী কাণ্ড!

লক্ষ্মণ বললো, আমি বললুম, এই যে কেবল কাপড় বিক্রি—বিক্রি তো হাতি-ঘোড়া, এ দিয়ে কী হয় ?

চীনেম্যানের তাতে ভীষণ লাগলো। বললো, আমি না-করলেই যেন হলো, অন্য কেউ কি তাহলে কাপলা বিক্‌াল করবে না ? হরেদরে সেই তো সমান !

এসব হলো হিসেব পত্তরের ব্যাপার।

তা লক্ষ্মণও তাতে কম যায় নাকি ?

বললো, আর কেউ করবে তো করুক, তোমার তাতে কী ? এ যেন সেই বনে-বাদাড়ে-ঘোরা গোসাপের গল্প আর কি, বলে ও না ঘুরলেই যেন হলো ! আর কেউ ঘুরবে না ?

চীনেম্যান তখন কেবল আঁক কষে, কেবল আঁক কষে।

সে কী আঁক, কী আঁক ! সোজা টান বাঁকা টান, কোণ তেকোণ কতো রকম—যেন একটা গোলোক ধাঁধা, শেষে হিসেব মিলিয়ে বললো, তা তোমার যে সকাল সন্ধ্যে কেবল হাঁইহুঁই ক্যানেস্তারায় করে জল বওয়া ! তার বেলা ?

লক্ষ্মণ বললো, হাঁইহুঁই, না ? বুঝলে বাছা, এটা সব কাজের সেরা।

এইবার হাসালে লক্ষ্মণদাদা ! জয় বললো, এই জল দেয়া ! এঃ—

লক্ষ্মণ একটুও গায়ে না-মেখে বললো, মেলা বাজে বকো না। সেরাই তো, সেরা নয়তো কী ? জলের আরেক নাম জীবন। জানো ?

চীনেম্যান বললো, তা ঠিক। একদম নির্ঘাৎ। আমাদের দেশে আছে হোয়াংহো আর ইয়াংসিকিয়াং ! কী জল, কী জল। বলো না ! বাব্বা !

তবে ? হেঁঃহে বাছাধন ! কী ?

চীনেম্যানকে জব্দ করে লক্ষ্মণ তার পানের কৌটো বের করলো।

আমি বললুম, জল কোত্থেকে এলো, লক্ষ্মণদাদা ?

বাঃ, কোত্থেকে এলো? লক্ষ্মণদাদা একটু রাগ করলো। যেন এটা অতি নিশ্চয় নিশ্চয় আমাদের জানা উচিত ছিলো। বললো, এলো আর কি। বৃষ্টি থেকে। মেঘ থেকে।

যাঃ। মেঘ থেকে? এসবও বিশ্বাস করতে হবে?

মেঘ কি যে-সে মেঘ? নাগাড়ে একশো বছর ধরে বৃষ্টি পড়েও শেষ হলো না। কতোখানি মেঘ জমে ছিলো আকাশে ভাবো দি'নি

একবার! এঃ—আর তাইতেই তো এসব নদীগুলো হলো। সমুদ্রগুলো হলো। আগে তো সব ছিলো শুকনো খটখটাং খানা খন্দ।

চীনেম্যান হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠলো।

ভারি মাজা তো! তা, ড্রাগন জানো, ড্রাগন? সে-ই তো বৃষ্টি-টিষ্টি তৈরী করে। ওই যে যার মুখ দিয়ে ভকভক করে আগুন বেরোয়! যে থাকে চুপচাপ সমুদ্রের তলায় ঘাপটি মেরে?

হ্যাঁ, বলেছে তোমাকে। যত্তোসব আজগুবী গুলতানি।

লক্ষ্মণ একদম চটে ওঠে, একতিলও বিশ্বাস করে না। বলে, ড্রাগন ফাগন আবার কী! এসব একদম বানানো!

কেন, কেন? জিজ্ঞেস করে চীনেম্যান।

আরে বাবা তা-ও জানো না? জলের ভেতরে আগুন হয় নাকি কখনো? নিভে যাবে না?

তাইতো!

আমরা সবাই হেসে উঠি। চীনেম্যানের মেয়েও হেসে উঠলো। চীনেম্যানও হেসে উঠলো। চীনেম্যানের মেয়ের গালদুটো স্বপ্নের জাদুতে রাঙা হয়ে উঠলো।

লক্ষ্মণের কী ভীষণ যে বুদ্ধি!

তারপর হাসাহাসি শেষ করে চীনেম্যান উঠে পড়লো। বললো, চলি এবার। বলে মেয়ের হাত ধরলো।

কাঁধে কাপড়ের ঝোলাটা জুৎ করে সাজালো। বললো, সূর্য তো না, যেন সাদা আগুন!

এই সেরেছে! লক্ষ্মণ হৈ হৈ করে উঠলো। সাদা আগুন, না?

বলে টুক্ করে পকেট থেকে বের করলো তিনকোণা একটা পুরু কাঁচ। বের করে চীনেম্যানের হাতে দিয়ে বললো, এঃ, কী কথার ছিরি। সাদা আগুন! দেখো দি'নি এটার ভেতরে তাকিয়ে।

তাকিয়ে দেখে চীনেম্যানের মুখে আর কথা সরে না।

দেখি, কোথায় সাদা? রামধনুর মতো ঝলমল করছে সব—লাল নীল বেগনী সবুজ—সব।

লক্ষ্মণদাদা বললো, সূর্যের মতো কিছুই হয় না।

এ যেন আকাশ জোড়া এক স্বপ্নের জাদুকর। পাতায় দিচ্ছে সবুজ, ফুলে দিচ্ছে লাল। লাল নীল হলুদ বাসন্তী। আর সব কিছুতে ঝলমলে আনন্দ। ঝলমলে ছন্দ।

সূর্য নইলে কে বাঁচতো?

মেঘ জমতো না আকশের কোণ-ঘিরে।

বৃষ্টিও পড়তো না। টুপটুপ। ঝরঝর।

রাণী বললো, চলো এবার ফুলপরীদের খেয়ালের খেলা দেখি গে—দেখি শিউলী ফুলে-ফুলে যাবার পথটা ভরে আছে।

আর কী গন্ধ!

আমি অবাক হয়ে বললুম, এ কি, ফাল্গুনে কি শিউলী ফোটে?

পরীর দেশে ফোটে। রাণী বললো। এখানে ফাল্গুনই বা কী, শ্রাবণ-ই বা কী। দিনও নেই, রাতও নেই। আসলে কী জানো, দিনরাত—সে আমাদের খুশীতে।

জয় প্রকাণ্ড একটি বুঝদারের মতো বললো, জানি। আর চোখের আকাশ-মাটি-সাগর স্বপ্নে মিশে একাকার।

ঠিক তাই। রাণী বললো, ঠিক তাই।

নইলে পরীদের কাজ ফুরোতো।

দেখি দক্ষিণের মাঠ জুড়ে প্রকাণ্ড একটা শামিয়ানা।

তাতে সোনালী ঝালর, খয়েরী লেস দিয়ে ফুলকারি-করা। আর তার মধ্যে যতো রাজ্যের পাখিরা বসে আছে।

কারো হাতে ঝাউপাতার পাখা, কারো মাথায় কাশফুলের মুকুট।

এ যেন বিরাট এক যাত্রার আসর।

বললুম, যাত্রার মতন ঠেকছে?

রাণী বললো, না। ও-ই তো ফুলপরীদের মেলা।

দেখি ফুলের বাগানে ফুলের মতো পরীরা নাচছে, গাইছে।

চোখ জুড়িয়ে যায়। কী যে সুন্দর! দেখে দেখে আশ মেটে না।

রাণী বললো, ওই যে একদম মাঝখানে রক্তপদ্মের আসন, দেখতে পাচ্ছো? সেই হলো রাণীর সিংহাসন।

আমি অবাক। বললুম, তুমি তো রাণী, সেটা কি তোমারি জন্যে?

হ্যাঁ, সেই তো নিয়ম।

বলে চোখের পলকে রাণী সেই আসনে গিয়ে বসলো। পদ্মের পাপড়িতে যেন শিশিরের ছোঁয়া লাগলো।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম।

ফুলপরীরা সবাই একে একে রাণীকে ঘিরে দাঁড়ালো। সবার হাতে একটা করে রঙের তুলি। তার এককেটি ছোঁয়ায় এককে রঙের ফুল হয়। কেউ চাঁপা, কেউ গোলাপ, কেউ বেল-জুঁই-মল্লিকা।

রাণীর মাথায় তারাফুলের মুকুট।

গলায় গজমোতির হার।

কপালে হীরের টিকলি।

আর গলায় যেমন মুক্তো, তেমন হাতজুড়ে গয়না। কানে গয়না, নাকে গয়না। ফুলঝুরির নোলক।

এই রাণী! দেখতে দেখতে কী আশ্চর্য অন্যরকম হয়ে গেলো। চেনাই যে যায় না!

শামিয়ানা জুড়ে রঙের মেলা।

যেন আমাদের দোল। কতো রকম যে রঙ। আর পরীদের সে কী সাজ! ঝলমলিয়ে উঠছে সব।

তখন আমার পাশে-বসা বউকথাকও পাখিটি বললো, এককেদিন

একেকজন রাণী হয় কি-না। আজ হলো চাঁদপরীর রাণীর পালা। তাই অতো ঝলমলে খেয়ালের খেলা চলছে।

আমি বললুম, একেকদিন একেকজন রাণী ?

কেন হবে না! এখানে সবাই তো রাণীর মতন। কেন হবে না ?

জয় বললো, কী অবাক কাণ্ড! আবার কাল একজন ?

বউকথাকও কিছুতেই বুঝতে পারে না, এতে অবাক হবার কী আছে? বললো, হুঁ। কাল একজন কেউ-না কেউ। পরশু একজন। তরশু একজন।

তারপর একটু দম নিয়ে বললো, তবে কাল বসন্ত পরী হতে পারে।

তুমি কী করে জানলে ?

খিলখিল করে হেসে উঠলো বউকথাকও।

জানলুম আর কি! সে তো সবাই জানে! কেন, তুমি জানো না? ভেবে দেখো তো একটু।

আমি ভাবতেই দেখি আরে, তাইতো, কাল তো বসন্ত পরীরই রাণী হবার কথা!

আর কাল হবে মেঘ পরীদের খেলার খেয়াল।

তাই না ?

বউকথাকও ঠিক তক্ষুনি উড়ে গেলো দূরের একটা থামের আড়ালে।

সেখানে একটা দোয়েল বসে আছে—ওই যে!

ঠিক তাই। হ্যাঁ। গম্ভীর গলায় কেউ অন্য একজন বললো পাশ থেকে।

তাকিয়ে দেখি একটা ল্যাজ-ঝোলা ভৃংগরাজ। একমনে রাণীকে দেখছে।

রাণীকে সাজিয়ে এবার সবাই ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো।

দিনরাতের হিসেব যদি থাকতো তাহলে কী যে হতো, ভাবাই যায় না। এখানে কখন যে কী হচ্ছে কেউ বলতে পারে না হিসেব করে। কখন ঘুম থেকে ওঠা, কখন শুতে যাওয়া, কখন খেলা, কখন পড়া—সব একাকার!

সেই যে এক মার্কিন সায়েবের গল্প শুনেছিলুম, ঘরে ক্যালেণ্ডার নেই, ঘড়ি নেই, আর সারা বাড়ি পর্দায় ঢেকে ঘরে আলো জেলে রাখতো সব সময়। ও তো ঘরের বাইরেও যেতো না কখনো। তাই শীত নেই, গরম নেই, দিন নেই, রাত নেই। দারুণ মজা। এও তাই।

ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুড়িবুড়োর সংগে দেখা।

এখন আর ওর দোকানে ঘুড়ি নেই যে দূর থেকে দেখা যাবে। এখন কেবল নানা রঙের বেলুন।

বললুম, চৌ-মাথার মোড়ে বড়ো-যে বেলুনের দোকান সাজিয়েছো?

বেলুনবুড়ো সাদা দাড়ি নেড়ে বললো, দোকান কি আর সাধে সাজিয়েছি?

কাল হলো তো চাঁদ-পুকুরের মেলা।

সে আবার কী? চাঁদ-পুকুর! কী অদ্ভুত নাম! জয় বললো।

বেলুনবুড়ো বললো, চাঁদ-পুকুর হলো হরিণ আর খরগোসদের মেলা। যেখানে যতো আছে সবাই আসবে ঝেঁটিয়ে।

তা, বেলুন দিয়ে কী হবে, অতো অতো বেলুন? ওরা কি বেলুন ঝুলিয়ে ঘর সাজাবে ওদের?

সেই হাসিটা শুরু হলো এবার। দাড়ি দুলিয়ে গাল ফুলিয়ে চোখ কাঁপিয়ে হাসি। তারপর হাসি চেপে বললো. এতোকালেও একরত্তি বুদ্ধি হলো না তোমাদের! যতোসব আজগুবী কথা, কোথায় যে শিখলে!

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। জয় বললো, ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে। এবার বেলুনের ইতিহাসখানা বলা হোক—

বেলুনবুড়ো বললো, ওরা আসে যায়। আসে, যায়। কোথায় ঘর, কোথায় কী, এসে রাণীর সংগে কথাবার্তা বলে একমিনিট, তারপর চাঁদ-পুকুরের মেলা।

বেলুন সাজাবার সময় কোথায় ?

তবে ?

তবে আবার কী! বেলুন হলো এককেটা দেশের ছবি। যেমন পতাকায় লেখা থাকে, সেই রকম। যে-যার চিনে নেয়। আর চেনা জানা সবার সংগে পুরোনো দিনের গল্প হয়। এইসব আরকি! চাঁদ-পুকুরে চাঁদ নেই, পুকুর তো নেই-ই নেই। আসলে সবাই চাঁদপারা সুন্দর কিনা, তাই।

আর পুকুর ? জয় কি অত সহজে ছাড়ে ? বললো, পুকুর এলো কোত্থেকে মশাই ?

বেলুন বুড়ো আবার সেই হাসিটি হাসতে যাচ্ছিলো এমন সময় একটা ঘোড়া এলো টগবগিয়ে। সাদা ধবধবে গায়ের রঙ, যেন দুধে ধোয়া। আর পিঠে দুটো ঝলমলে পাখা। সোনা দিয়ে মোড়া। আর কপালে মুক্তোর টিকলি।

বেলুনবুড়ো আমাদের বললো, এই হলো পক্ষিরাজ ঘোড়া। যে পরীর দেশের রাজকুমারকে বেড়াতে নিয়ে যায়, দূরে দূরান্তে। কখনো মেঘে, কখনো সাগরে। ফুলে ফুলে, হাওয়ায় হাওয়ায়।

তারপর ওকে বললো, কি হে বাছা, তোমার যে আর দেখাই মেলে না—

কী ব্যাপার ?

পক্ষিরাজ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বললো, তা আর বলো না। রাজকুমারকে তো জানো, বসন্তপরীকে খুঁজে আনতে বিশ্বভুবন তোলপাড় করে ছাড়লো।

সেই যে গিছলুম—এই ফিরলুম। ওফ্—

বেলুনবুড়ো বললো, বটে, বটে? তা বলবে একটুখানি কী হলোটলো?

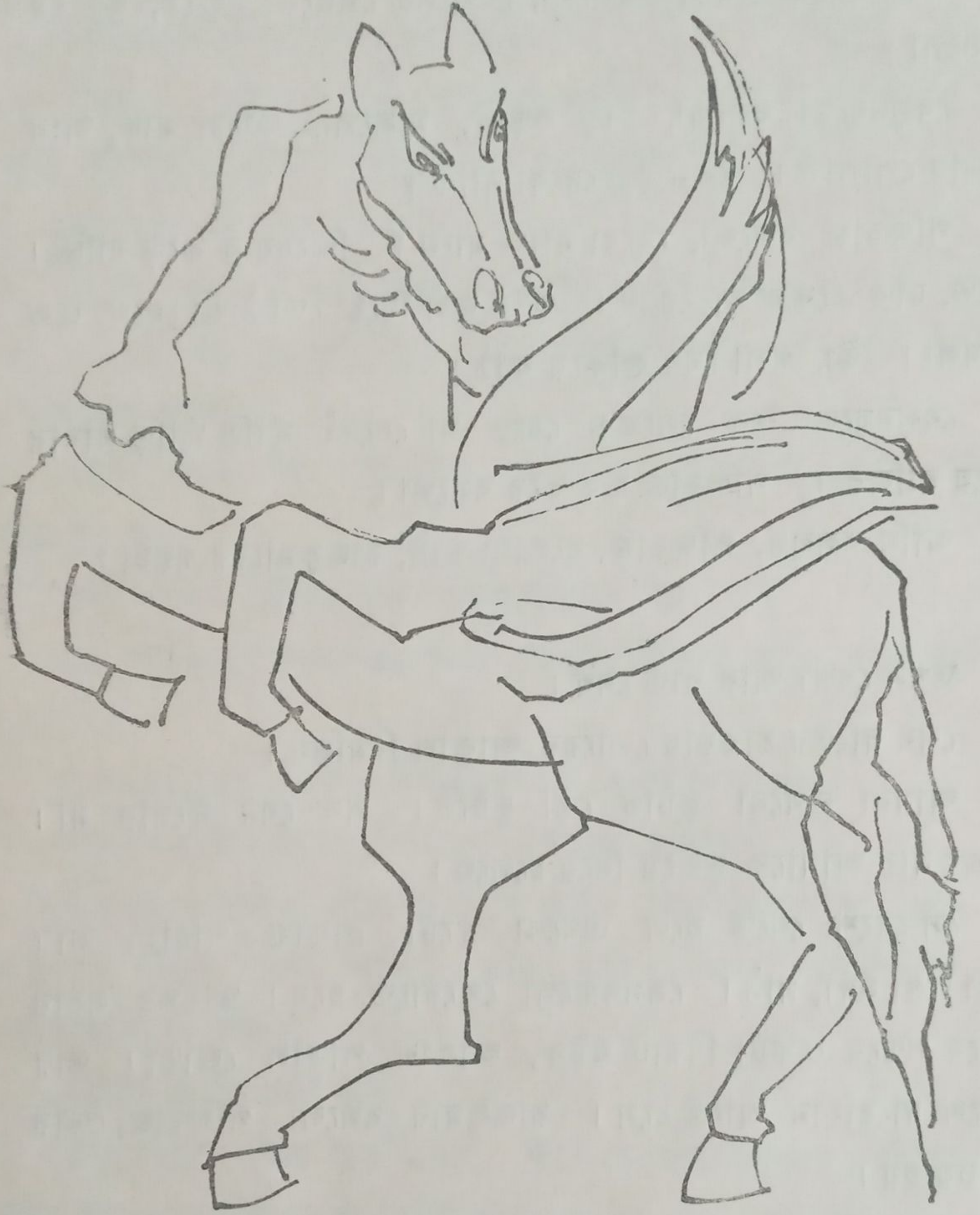

ওই হলো তোমার এক কাণ্ড। পক্ষিরাজ হেসে বললো। কেবল গল্প, কেবল গল্প। হতে আমার মতন ঘোড়া তো বুঝতে কত ধানে কতো চাল! হেঁঃ।

বেলুনবুড়ো হৈ হৈ করে উঠলো।

বালাই ষাট, ঘোড়া বলে কোন মুখ্যু! বলো, পক্ষিরাজ। পিঠে দুটো ডানা আছে না?

ওই হলো, ওই হলো।

একটু থেমে পক্ষিরাজ বললো, বেলুনের পেছনে ওই-যে, কী হে ওগুলো?

বেলুনবুড়ো বললো, মুড়ি কড়াই, মালপো, ক্ষীরের নাড়ু আর ছানার পোলাও। কেন? দেবো নাকি?

পক্ষিরাজ বললো, দেবো নাকি মানে? ক্ষিধেয় কুঁকড়ে যাচ্ছি। দাও, দাও একেক বারকোষ। আর জল দিয়ো তো ঠাণ্ডা দেখে এক গামলা। উঃ, গলা যেন শুকিয়ে কাঠ!

বেলুনবুড়ো এক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার নিয়ে হাজির। পক্ষিরাজ জুৎ করে বসলো।

আমি বললুম, পক্ষিরাজ, বলোনা ভাই, রাজকুমারের গল্পটা?

তখন বেশী আর রাত নেই।

শেষ রাতের হাওয়ায় ভোরের আকাশ রিমঝিম।

আমরা তখনো ছুটছি তো ছুটছি। পথ যেন ফুরোয় না। রাজকুমার আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

সে-দেশে যেতে হলে এখনো দুটো প্রকাণ্ড পাহাড়, আর গণ্ডা গণ্ডা নদী, মাঠ। সেসবগুলো পেরোতে হবে। তারপর সবার শেষে পড়বে একটা বিরাট ফটক, আকাশ পাতাল জোড়া। তার পাশে দারোয়ান আছে বসে। রাজকুমার বললো, পক্ষিরাজ, ভোর যে হয় হয়।

আমি বললুম, কোথায় ভোর? এখনো সমুদ্রের ওপারে পশ্চিমের দেশে সুর্যই যে ডোবেনি! ভোর কি অতো সাত তাড়াতাড়ি হয়? ভেবো না।

রাজকুমারের বাহনই বলো, আর বন্ধুই বলো, সবই তো আমি।

তাই আমি ওকে সাহস দিয়ে বললুম, ভেবোনা, দেখো ঠিক ভোরের আগেই পৌঁছে যাবো।

সে দেশের রাজা হলো এক সিংহ।

সিংহ। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। আপন মনে থাকে। আর মাঝে মাঝে কেবল গোলাপ জলের পুকুরে চান করে।

ওই ওর এক কাণ্ড।

সিংহের রাজ্যে দিনের বেলা কেউ ঢুকতে পারে না। না হাওয়া, না আলো, না ফুলের গন্ধ। তাই সবাইকেই যেতে হয় রাত পোয়াবার আগে।

সিংহ, কিন্তু সিংহ তো নয়। আসলে এক রাজপুত্তুর। সিংহ হয়ে আছে।

সেই রাজার ছেলের ছিলো শিকারের নেশা।

রথ সাজিয়ে লোকলস্কর নিয়ে কেবল শিকার করে বনে বনে বেড়ানো।

দিন নেই, রাত নেই—কেবল শিকার কেবল শিকার।

রাজা বলতো, অতো শিকারের নেশা কি ভালো?

রাজকুমার বলতো, বনে বনে ঘুরে আমি বনের লতাপাতা জীব-জন্তুদের সংগে কথা বলি। ভাব করি। আর ভালোবাসি। ভালোবাসা কি মন্দ?

মন্ত্রীরা হৈ হৈ করে ওঠে।

ওসব ছেঁদো কথায় ভুলছি না! তবে যে বলো শিকার? শিকার মানে কী? রাজার ছেলে মিটিমিটি হাসে।

শিকার অনেক রকম হয়। সে সব তোমরা জানো না, সেসব তোমাদের বইয়ে লেখে নি। আমি শিকার করি ওদের মন। ভাব করে। ওদের সংগে সুখ-দুঃখের কথা বলে।

ওরা রাজপুত্তুরের সংগে কথায় পেরে ওঠে না।

বলে, তুমি এখন বড়ো হয়েছো। দুদিন বাদে তুমিই হবে রাজা।

তা বলুক গে। রাজার ছেলে বেরিয়ে পড়ে শিকারে।

সঙ্গে তার বন্ধুরা। আর পোষা পায়রাটি। তার নাম জাবাজি। পুবের দেশ থেকে আনা পোষা পায়রা।

জাবাজি মানে স্বর্গের নদী।

শিকার করে করে দিন যায় রাত যায়, দিন যায় রাত যায়।

মাসের পর মাস যায়। বছরের সীমা ছোঁয় ছোঁয়।

রাজকুমারের শিকারই শেষ হয় না।

এদিকে বুড়ো রাজার ভারি অসুখ।

একদিন সন্ধ্যেবেলা রাজপুত্‌্র নাইতে গেলো গোলাপ জলের পুকুরে।

গিয়ে যেই না জলে নেমেছে, শোনে, ওপাশের চাঁপা ডালের আড়াল থেকে একটি ফুটফুটে ময়না ডানা ঝাপটাচ্ছে।

কে রে আমার গোলাপ পুকুরে চান করে ?

রাজপুত্‌্র বললো, আমি ক্ষীরসাগরের পলাশ।

পলাশ ?

হ্যাঁ, ক্ষীরসাগরের রাজকুমার।

তা, এখানে তো আরো গোলাপ পুকুর আছে। যাও-না সেখানে।

এটা আমার !

যাঃ! তাই কখনো হয় নাকি ? তুমি তো একটুখানি একটা পাখি। এসো না, ভাব করি !

ঠিক অমনি সময় পুবের আকাশ হঠাৎ ঝম্ করে আলোয় আলো হয়ে উঠলো।

ময়না চাঁপা ডালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। আহা, ময়না তো নয়, চাঁপাদের রাজকন্যা। নাম তার চম্পা।

চম্পা বললো, পলাশ, এ-পুকুরে কারো চান করতে নেই !

কেন ? বাঃ রে, এ-বন আমার রাজ্যে না ? এ-পুকুরও আমার। আমি এতেই চান করবো।

বলে যেই না ডুব দিয়েছে, অমনি ও একটা সিংহ হয়ে গেলো ছম করে।

আসলে চম্পা কে জানো ?

সেই বনের রাণীর মেয়ে। চাঁপাদের কতো আদরের !

ক্ষীরসাগর তো ক্ষীরসাগর। পৃথিবীতে কোথাও কেউ নেই যে চাঁপাদের রাজকুমারীর কথা না-শুনে পারে। আর যে না-শোনে, সে-ই অন্যরকম কিছু-না-কিছু হয়ে যায়। কেউ কুমীর, কেউ হরিণ।

রাজকুমার সিংহ হয়ে গেলো।

কিন্তু এ-কথা আর কেউ তো জানলো না।

জানলো কেবল ডাবাডি।

সে লেবুগাছের মগডালে বসেছিলো। বসে বসে সব দেখছিলো।

সে কখনো পলাশের থেকে দূরে থাকে না।

ডাবাডি ছিলো পলাশের বড়ো আদরের।

সিংহ হয়ে পলাশ তখন বনের ভিতর চলে গেলো।

এক বন থেকে অন্য বনে। এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে।

কেউ তো তাকে চেনে না, সে-ও তখন কাউকে চিনতে পারে না।

পারবে কি করে ?

সে তো তখন জাঁদরেল এক সিংহ। পাটকিলে গায়ের রঙ, ঘাড়ের ওপর ফোলা-ফোলা কেশর।

আর, যখন ডাকে, আকাশ যেন চমকে ওঠে।

ডাবাডি বললো, পলাশ, চলো আমরা পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে চলে যাই। সেখানে—

কী সেখানে ডাবাডি ? পলাশ বললো।

সেখানে আছে বিরাট একটা মরুভূমি। কেউ সেখানে থাকে না। না পাখি। না পশু, মানুষ, জীব-জানোয়ার। চলো, সেখানেই

চলে যাই। সেখানে গিয়ে তুমি হবে রাজা। নতুন প্রজারা আসবে সাত রাজ্যি থেকে।

মরুভূমিতে কি করে থাকবো?

ডাবাডি হলো স্বর্গের নদী। সে জানে জাদু। কি করে শুকনো ডাঙায় আনতে হয় জল। কি করে খা-খা প্রান্তরে ফোটাতে হয় ফুল। সে যে স্বর্গের নদী!

ডাবাডি বললো, চলোই না আগে। দেখবে'খন সেখানে গিয়ে।

এদিকে গোলাপ-পুকুরের পারে দাঁড়িয়ে চম্পা দেখলো কী?

চম্পা দেখলো, দেখতে দেখতে পলাশ সিংহ হয়ে গেলো।

গোলাপ হলো চম্পার বন্ধু।

গোলাপ বললো, ইস্, রাঙা টুক্‌টুকে রাজপুত্তুর চোখের পলকে সিংহ হয়ে গেলো! আহা, এখন উপায়?

কি করে রাজ্য থাকে?

সে যে রাজার ছেলে! দুদিন বাদে ও-ই তো হতো রাজা। আর সে তো কারো মন্দ করে নি! এখন উপায়?

চম্পা অবাক। কিসের উপায়?

কি করে বুড়ো রাজা প্রাণে বাঁচে? কি করে রাজ্য থাকে? আহা, ওর মা-তো জানতেও পাবে না, কেবল ছেলের জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবে—কবে আমার চাঁদের কণা ছেলে ফিরে আসবে শিকার থেকে!

পলাশ তখন সিংহ হয়ে কেশর ফুলিয়ে উঠে আসছে জল থেকে ডাঙায়।

আর ডাবাডি, স্বর্গের নদী, শুনছে ওদের কথা লেবুগাছের মগ-ডালে বসে বসে। গোলাপ আর চম্পার কথা।

চম্পা বললো, ভাবনা কিসের? পলাশ হবে পশু-পাখির রাজা।

রাজার ছেলে, রাজাই তো রইলো, এক চেহারা ছেড়ে অন্য চেহারায়।

আর পশ্চিম সাগরের ওপারে ওর রাজ্যের সীমানায় হবে ধনেশ পাখির ফটক। সেই ফটক না-পেরিয়ে কারো সাধ্যি নেই পলাশের রাজ্যে ঢোকে।

সেখানে যেতে হলে কতো সাগর কতো পাহাড় পেরোতে হবে। মাঠ নদী প্রান্তর পেরোতে হবে। সেখানে পলাশ হবে রাজা।

তারপর?

তারপর একদিন, যেদিন বসন্তপরীকে নিতে আসবে পরীর দেশের রাজকুমার, সেইদিন আবার পলাশ মানুষ হয়ে যাবে। কিন্তু, সে-তো অনেক, অনেক দিন পরে।

চম্পা বললো, বসন্তপরীকে যেদিন নিতে আসবে পরীর দেশের রাজকুমার, সেদিন সেই প্রথম চাঁপা ফুল ফুটবে সে-দেশে।

কিন্তু, গোলাপ বললো, কিন্তু ধনেশ পাখির কথার জবাব কি কেউ দিতে পারবে?

পারবে। সে পরীর দেশের রাজকুমার।

আসবে সে। আসবে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে। সে-ই দেবে ধনেশ পাখির কথার জবাব। সেদিন চাঁপা ফুলে আকাশ যাবে ঢেকে।

সিংহ হলো সেই পলাশ।

সে গোলাপ জলের পুকুরে চান করে সেখানে। স্বর্গের নদী থেকে সেই পুকুরে আসে জল।

একদিন ডাবাডি বললো, দেশে কতো গাছ, কতো লতাপাতা ফুল কিন্তু সে-কেবল একটি দিনের জন্যে। তারপর রাত ফুরোতে না-ফুরোতেই ধূ-ধূ মরু। আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

পলাশ বললো, আমার রাজ্যে পরীরা কেউ আসে না-যে! পরীদের ছোঁয়া না-পেলে ফুল-পাতা কি থাকতে পারে কখনো? পারে না। তাই আমার দেশে ফুল ফুটতে-না-ফুটতেই শুকিয়ে যায়।

হায়! পলাশ মন ভার করে থাকে।

ডাবাডিও মন ভার করে থাকে। হায়!

এদিকে রাতে যখন চাঁদ ওঠে আকাশে, তখন স্বপ্নের পাখিরা উড়ে আসে কতো-কতো দূরের দেশ থেকে। কিন্তু যেই না সূর্য ওঠে, কেউ আর আসতে পারে না সে-দেশে। না আলো, না হাওয়া, না ফুলের গন্ধ।

কী করে আসবে বলো?

চাঁপাদের মেয়ের গোলাপ-পুকুরে চান করেই তো সব গোলমাল করে ফেললো পলাশ। নইলে—

দিন যায় এমনি করে।

দিনের পর দিন।

রাতের পর রাত।

এমনি করেই বছরের পর বছর ঘুরে যায়। সিংহ পলাশের মনে সুখ নেই।

মনে সুখ নেই।

আর, যখন একা থাকে তখন কেবলই ভাবে।

ভাবে, শুনলেই হতো বাবার কথা। শিকারের জেদ না-ধরলে আজ সিংহ হয়ে এই দূর সুদূরে থাকতেও হতো না।

মনে পড়ে ওর চাঁপাদের সেই রাগী মেয়েটির কথা, যে চাঁপাডালের আড়ালে বসে ছিলো একফোঁটা ময়না হয়ে।

সিংহ পলাশ কতো কথা ভাবে।

সিংহের রাজ্যে সবাই কিন্তু সুখী।

কেউ কাউকে ভয় দেখায় না, কেউ কাউকে তেড়ে আসে না। কারো মনে ভয় নেই। সবাই যে-যার আপন মনে ঘুরছে, ফিরছে, সংসারের কাজ করছে। যে-যার আপন মনে।

কিন্তু সবার ওপরে যে রাজা, তারই মনে সুখ নেই।

ডাবাডি বলে, পলাশ, মন খারাপ করো না। সংসারে কতো কী হয়, তাই বলে গোমড়া মুখে বসে থাকলে কি চলে? আর তুমি হলে এ-দেশের রাজা! ছি—

সিংহ পলাশ বলে না কিছুই।

কেবল চুপচাপ বসে থাকে।

আর ভাবে।

গোলাপ পুকুরে চানের কথা মনে পড়ে পলাশের।

বন থেকে বেরোতে যাবে, ঠিক তেমনি সময় কারা সব হৈ হৈ করে ছুটে এলো।

কারো হাতে লাঠি সড়কি, কারো হাতে তীর ধনুক। কারো হাতে মোটা মোটা দড়ির ফাঁস। ফাঁস পরিয়ে সিংহকে ধরবে, তাই।

পলাশ অবাক! একটু একটু করে সবাইকে সে আবার চিনতে থাকে। মনে পড়ে।

দেখে, আরে, এরা যে ওর নিজেরই লোক! কেউ মন্ত্রীর ছেলে, কেউ সেনাপতির ছেলে। বন্ধুরা সবাই এক সংগে শিকার করতে এসেছিলো। কিন্তু ওরা তো আর জানে না যে পলাশই সেই সিংহ!

পলাশের তা দেখে দারুণ মন খারাপ হয়ে গেলো।

মনে হলো, ওরা তো তাহলে সত্যিই ওর বন্ধু না! নইলে ওকে মারতে আসবে কেন? হলোই বা সে এখন সিংহ, আসলে সে তো পলাশ-ছাড়া আর কেউ নয়!

তাহলে?

ডাবাডি বললো, সেই হলো কষ্টের কথা।

জীব-জানোয়ারকে, পশুপাখিকে কেউ সত্যি সত্যি ভালোবাসে না। কেবলই তেড়ে আসে। ভয় দেখায়। মেরে ফেলে।

তাই তো ওরাও মানুষকে ভালোবাসতে পারে না। বনে জংগলে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে। মানুষের দেখা পেলেই ভয়ে পালায়।

ডাবাডি তখন পলাশকে বললো, চলো আবার বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকি। তাহলে কেউ আর আমাদের হুট করে খুঁজে পাবে না। চলো। কিন্তু বললেই কি হয়?

পলাশ পথ জানে না বনের। কি করে ঢোকে বনে? তাই ও কেবলই হারিয়ে যায় এদিকে-ওদিকে আর তাড়া খেয়ে খেয়ে ঝালা-পালা হয়। সবাই ওকে হৈ হৈ করে তেড়ে আসে।

এই করে অস্থির ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একসময় এক দূরের শাল-গাছের আড়াল থেকে পলাশ দেখলো, যাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসতো, সেই মন্ত্রীর ছেলেই প্রকাণ্ড একটা লোহার অস্ত্র নিয়ে ওর দিকে তেড়ে আসছে। তার লাল চোখ দুটো রাগে আগুনের মতো জ্বলছে।

কিন্তু কেন যে ওর অতো রাগ, কিছুতেই পলাশ তা ভেবে পেলো না।

পলাশের ভয় নেই।

সে হলো সিংহ—পশুদের রাজা।

মানুষকে তার ভয় পেতে নেই।

তবু, বনের পথ তো সে জানে না; তাই কেবলই ধাঁধার মতন গুলিয়ে যায়।

ডাবাডি ওড়ে আকাশে-আকাশে।

সে সবই দেখতে পায়। আর ওর আছে স্বর্গের জাদু।

সে তো স্বর্গের নদী। তাই ওর মনের কথা কেউ জানতে পারে না।

ডাবাডি দেখে পলাশের ভারি মুশকিল। কোণঠাসা হয়ে শাল গাছের আড়ালে আটকে আছে। ডাবাডি স্বর্গের মন্ত্র দিয়ে সূর্যকে ঢেকে দিলো এক পলকে।

আর যেই না সূর্য ঢেকেছে, অমনি ঢুম করে চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার!

কেউ কিছু দেখতে পায় না। আঁধারে যেমন হয়।

বনের ভেতরে তখন সবাই হারিয়ে হারিয়ে যেতে থাকলো।

ওরা না-পায় বেরোবার পথ, না-পায় কেউ কাউকে দেখতে।

দারুণ গোলমাল সুরু হলো! সিংহকে মারবে কী, এখন নিজেরাই এ ওর দিকে তেড়ে এসে সে-এক ভয়ংকর খুনোখুনী কাণ্ড!

আর রাত হবার সংগে সংগেই সিংহ পলাশের চোখে যেন আরো আলো ফুটে উঠলো। বনের পথে সে আর দিশেহারা হলো না।

ডাবাডি বললো, চলো এই বেলা।

কোথায়? তুমি কি বেরোবার রাস্তা জানো?

ডাবাডি বললো, কেন জানবো না? ওই যে প্রকাণ্ড শিমূল গাছটা দেখছো, তার বাঁয়ে আছে একটা অশোক যাতে গুলঞ্চলতা এঁকেবেঁকে উঠেছে—

দেখছো?

পলাশ তো অতোখানি দূরে দেখতে পায় না ডাবাডির মতন তায় আবার আঁধার। তবু শিমূলটা যা ঝাঁকড়া-মাথা, না দেখে কি সাধ্যি আছে! আর পলাশ তো শিমূল ফুলের রাঙা টকটকে রঙটার কথাও জানে মনে মনে। ভালো করে নাই বা দেখলো! আর ও তো জানে, কতো কতো পাখি শিমূল ফুলের রেণু খেতে উড়ে আসে দূর দূর থেকে। পলাশ বললো, হ্যাঁ, অশোক, আর তাতে গুলঞ্চলতা। দেখতে পেয়েছি। অন্ধকারে চাপ বেঁধে আছে।

তার পাশে আছে একটা ঝর্ণা। যার এক পাশে জল গরম, অন্য পাশে ঠাণ্ডা।

যাঃ, তা-ও কি হয়? পলাশের দারুণ অবাক লাগে।

ডাবাডি বললো, হয় কি না-হয় এক্ষুনি দেখতে পাবে। আমরা তো যাচ্ছি সেই ঝর্ণা তলাতেই।

এদিকে দারুণ মার মার কাট কাট চলছে বনের ওপারে।

আর কী হুল্লোড়, কী কান ফাটানো চেঁচামেচি!

কেউ তো কাউকে দেখতে পায় না। গাছে গাছে লাগে ঠোক্কর। বনের লতায় পা যায় জড়িয়ে।

আর পাখিরাও ফিরে আসছে আকাশে ডানার গন্ধ ঢেলে, ভাবছে, আরে, আজ সন্ধ্যেটা যে বড্ডো তাড়াতাড়ি এসে গেলো!

এসব যে ডাবাড়ির কাণ্ড তা কি কেউ জানে নাকি? জানে না। জানে কেবল পলাশ আর আকাশ আর চন্দ্রসূর্য তারারা।

আর জানে কে? না, হাওয়া, আর ফুলের গন্ধ, আর জোনাকিরা।

পলাশ আর ডাবাড়ি তখন ঝর্ণাতলায় এসে গেছে।

ওপাশের শোরগোল আর তখন শোনাই যায় না।

ঝর্ণার ওপর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি।

পলাশ দেখে, তাই তো—এক পাশে তার গরম, সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে ধূপের মতো। অন্য পাশের ঝিরিঝিরি ঠাণ্ডায় হাঁসেরা কাটছে সাঁতার। কী অবাক কাণ্ড!

ডাবাড়ি বললো, ওই দেখো, তুপাশেই আছে সিঁড়ির ধাপ। যেমন গরমে, তেমনি ঠাণ্ডায়।

ওরা তখন গুলঞ্চলতার তলায় একমিনিট জিরিয়ে নিতে বসলো।

এমন সময় ঠাণ্ডা জলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো একটি ফুটফুটে মেয়ে।

পলাশ বললো, ওই দেখো, কোত্থেকে যে এলো হঠাৎ!

ডাবাড়ি চেয়ে-চেয়ে চেয়েই থাকলো। একটাও কথা বললো না।

সেই মেয়েটি তখন উঠে এলো একটা সামপানে। তাতে বসে আছে ফুটফুটে আরেকটি মেয়ে। ওরই বয়সী। ঝকঝকে সাদা সাটিনের জামা গায়ে, যেন চাঁদের আলো হঠাৎ এক জায়গায় জমা হয়ে আছে। আর এই মেয়েটি পরেছে সবুজ রেশমী পোশাক, যেন ছোটো দেবদারু গাছের নতুন পাতা—রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠছে।

ওরা তুজন সামপানে ভেসে যায়।...

ভাসে। আবার আসে। মিটিমিটি হাসে।

ডাবাড়ি একটাও কথা বলে না।

পলাশ বললো, কী ব্যাপার ? অমন উতলা হয়ে রইলে যে বড়ো ? ওরাই বা কারা ? চেনো নাকি ?

ডাবাডি চুপিচুপি বললো, একজন শীতপরী, ওই যে যার গায়ে সাদা সাটিনের জামা। আর অন্যটি বসন্তপরী।

পলাশের মুখে কথা সরে না।

বলো কা, বসন্তপরী ? সেই বসন্তপরী ?

হ্যাঁ। যে ফুল ফোটায় বসন্তে। সাজায় সবাইকে নতুন পাতায়, নতুন রঙে। বসন্তে। আর শীত হলো ওর বোন, শীত দু'মাসের বড়ো।

পলাশ তক্ষুণি এমন জোরে শ্বাস ফেললো, কী বলবো, আর ওরা দুটিতে ফিরে তাকিয়ে দেখে, মাগো, গুলঞ্চতলায় বসে আছে, প্রকাণ্ড একটা সিংহ !

ভয় পেয়ে ওদের সামপান দুলে উঠলো। শীতপরী আর বসন্ত-পরী একপলকে হারিয়ে গেলো সিঁড়ির তলায়। আর দেখা গেলো না ওদের !

ডাবাডি দারুণ মন খারাপ করে বললো, ইস, কেন যে অমন করলে ! তোমাকে নিয়ে আর পারিনে ! বোকারাম। সব গুবলেট করে দিলে—

পলাশ বললো, আমার কি ছাই মনে আছে যে আমি একটা সিংহ ! শ্বাস ফেলতে যে আকাশ-বাতাস দুলে উঠবে আমি তা জানতুম নাকি কখনো ?

যাক গে, যাক। যা হবার হয়েছে।

বরং এবার চলো ওঠা যাক। রাতারাতি যতোটা পারি এগোই, এসো। পলাশ বললো, এগোতে হয় তুমিই এগোও। আমি উঠছিনে। বলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বললো, এই বসলুম, হুঁ।

মানে ? ডাবাডি অবাক হয়ে পলাশের মুখের দিকে তাকায়। তুমি কি থাকছো নাকি এই ঝর্ণাতলায় বসে ?

হুঁ। চুপচাপ। কখন আবার বসন্তপরী আসে।

ডাবাডি বললো, তোমার তাতে কী? আসলে আসুক।

সিংহ মায়া-মায়া চোখে তাকায়। বললো, আমার জীবন মরণ।

ডাবাডির হঠাৎ মনে পড়ে গেলো পুরোণো দিনের একটা গল্প।

পলাশ তখন বাচ্চা ছেলে। আপন মনে ঘুরে বেড়ায় মালীদের সংগে, রাজবাড়িতে মস্ত বাগান!

কতো ফোয়ারা, কতো পাথরের পুতুল তাতে। আর মালীরা খুরপি হাতে ঝাঁঝরি হাতে ফুলগাছদের যত্ন করে বেড়ায়।

পলাশের দারুণ মজা। একেক সময় একেক রকম ফুলে বাগান ভরে যায়। কখনো ফোটে বেল জুঁই মালতী, কখনো শিউলী, কখনো চন্দ্রমল্লিকা আর সূর্যমুখী। ফুলের ঝলমলে রঙের বাহারে আকাশেরই যেন রঙ বদলে যায়। পলাশ মালীদের সংগে সংগে ঘোরে—কখন ভোর কখন সন্ধ্যা একটুও খেয়াল থাকে না।

মালীরা তো কাজের লোক। যেখানে কাজ সেখানেই ওরা। কাজ যখন ফুরোয়, ওদের তখন ঘরে ফেরার পালা। যাবার সময় এলে ওরা বলে, পলাশবাবু, এবার যে বাড়ি ফিরতে হয়।

বাড়ি ফিরে কী হবে! এই তো বেশ। পলাশ বলে।

বাঃ, এটা কি একটা কথা হলো? মালীদের সর্দার হেঁকে বলে। যাও, এবার বাড়ি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসো। লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। বলে হাসতে হাসতে চলে যায়।

পলাশ অবাক হয়ে ফুলেদের কথা ভাবতে থাকে।

সময় গড়িয়ে যায়।

একেকটা ফুল একেক রকম। কেউ লাল, কেউ শাদা, কেউ নীল। কেউ আবার সবেতে মেশা ছিট-ছিট। ফোঁটা কাটা, ডোরা কাটা।

কেউ কেউ আবার সবুজও হয়! ঝাউবনের আড়াল থেকে একদিন একজন খুব মিষ্টি করে বললো। আছে, সবুজও আছে।

সবুজ ? যাঃ। ফুল আবার সবুজ হয় নাকি ? পলাশ চমকে তাকায়।

দেখে ফুটফুটে একটি মেয়ে। রেশমের চুল উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। সন্ধ্যার আকাশে হঠাৎ কে যেন একটা আলপনা এঁকে দিলো।

পলাশ জেদ করে বললো, সবুজ ফুল কখনো হয় না।

বসন্তপরী বললো, কাঁটালি চাঁপা দেখেছো ? কাঁটালি চাঁপা সবুজ।

পলাশ বললো, এঃ, ভারি এইটুকুন তো মেয়ে। তুমি জানলে কী করে ?

ওমা, আমি জানবো না ? খিলখিল করে হেসে উঠলো একফোঁটা মেয়েটি।

সেই হাসিতে বাগান ভরা ফুলের মেলায় রামধনু ফুটে উঠলো। বললো, আমি যে বসন্তপরী !

সেই থেকে ওদের দুটিতে ভারি ভাব।

সন্ধ্যে হতেই মালীরা ফেরে ঘরে আর পলাশ আসে কাঞ্চন গাছের তলায়।

আর সাদা সাদা ভুমো ভুমো ফুলগুলোকে নাচিয়ে দিয়ে আড়াল থেকে কাছে আসে বসন্তপরী। এমনিভাবে দিন যায়। তারপর—

কৃষ্ণচূড়ায় আকাশ যখন একদিন আগুনের রঙ ধরালো সেদিন বসন্তপরী পলাশকে ডেকে বললো, এবার যে যেতে হবে।

কোথায় ? অবাক হয়ে তাকায় পলাশ।

আবার সেখানে ফুল ফুটবে, আবার সেখানে গাছে গাছে লতায় লতায় কচিপাতার কুঁড়ি ফুটবে,— সেইখানে। ডাক এসেছে। হাওয়ায় হাওয়ায় ডাক এসেছে। উড়ে যাবার, দূরে যাবার ডাক।

পলাশ বললো, আবার কবে আসবে ?

আসবো। এমনি, হঠাৎ একদিন। চলে আসবো। তবে—

কী তবে ? উতলা হয়ে পলাশ শুধোয়।

তখন তুমি অনেক বড়ো হয়ে যাবে। এক দেশের রাজা। সেই তখন।

গল্পটা মনে পড়ে গেলো ডাবাডির।

পলাশ তো এখনো রাজা হয় নি।

আগে রাজা হোক। তারপর দেখা হবে বসন্তপরীর সংগে।

ডাবাডি বললো, এখানে বসে বসে কী হবে ? মনে নেই ? কী বলেছিলো বসন্তপরী ?

তারপর আবার দুজনে চলতে লাগলো। ডাবাডি ওড়ে আকাশে আকাশে।

পলাশ চলে মাটিতে মাটিতে। মাঝে মাঝে জিরোয় কোথাও না কোথাও।

তারপর আবার চলে।

যেতে যেতে রাত এগোয়। রাত ফুরোলে কিন্তু আর যাওয়া হয় না।

কে কখন দেখে ফেলবে, আর দেখলেই তো তেড়ে আসা, মারা মারি, দৌড় ঝাঁপ।

আবার দিন গিয়ে রাত হয়, তখন আবার চলা।

এই করে কতো যে দিন গেলো, মাস গেলো, বছর গেলো ! কেউ হিসেব রাখে না।

শেষে একদিন এইখানটায় এসে পৌঁছুলো পলাশ আর ডাবাডি।

ডাবাডির বন্ধু ধনেশ।

তার ঠোঁট দুটো যেন মাঝিদের খেয়া নৌকো।

খুঁজে পেতে এনে ধনেশকে গেটে বসিয়ে ডাবাডি বললো, এই বোকা, থাক এখানে বসে। দেখিস, দিনের বেলা কেউ যেন না ঢোকে রাজ্যের ত্রিসীমানায়। না আলো, না হাওয়া, না ফুলের গন্ধ।

আর রাতেই যেন সবাই পারবে ঢুকতে ?

না। যে তোর কথার জবাব দিতে পারবে, সেই। আর কেউ না। কেমন?

ধনেশের বুদ্ধির শেষ নেই।

পেল্লায় ঠোঁট দুটো খটাখট নেড়ে বললো, ঠিক হ্যায়। সে আর দেখতে হবে না। ধনেশের কথার জবাব দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

ঠিক হ্যায়। তোমরা এগোও। এই আমি বসলুম, অ্যা-এই।

বলে ধনেশ আসনপিঁড়ি হয়ে ফটক আগলে বসলো।

তারপর পলাশ আর ডাবাডি নতুন রাজ্য তৈরী করলো।

সেখানে কেউ কাউকে ভয় করে না। সবাই আপন মনে খুশীতে থাকে।

যে-যার নিজের কাজের কাজে, খেলার কাজে, কাজের খেলায় আর খেলার খেলা নিয়ে।

কিন্তু যতোক্ষণ রাত, ততোক্ষণ গাছ-লতায় ফুল। ভোর না হতেই টুপটুপ সব ঝরে পড়ে নতুন বর্ষার বৃষ্টির দানার মতো। তখন না আলো, না হাওয়া, না গন্ধ।

সে যে কী কষ্ট, পলাশ কাউকে বোঝাতে পারে না।

এই ভাবে দিন যায়।

একদিন ডাবাডি বললো, মন-খারাপ করে কি থাকে রাজারা কখনো? রাজাদের মন-খারাপ করতে নেই।

রাজারা গুম মেরে বসে থাকলে অন্যরা কি করবে?

সংসার ছারখার হয়ে যাবে। না, না, তা হয় না।

পলাশ কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। আর কেবল ভাবে।

ডাবাডি বললো, বসন্তপরীকে ডাকলে কেমন হয়? এখন তো তুমি রাজা। তাই না?

হঠাৎ খুশীতে ঝলমল করে উঠলো পলাশ।

তার মনে পড়ে গেলো সেই গল্পটা।

সেই যে অনেক অনেক দিন আগে কৃষ্ণচূড়ার আকাশে তখন আগুনের রাঙা রঙ? সেদিনকার কথা মনে পড়লো পলাশের।

আর মনে হতেই ডাক দিলো বসন্তপরীকে। মনে-মনে। মনে-মনে।

তখন মাঝ রাতের আকাশে তারারা ঝিলমিল করছে।

বাতাসে মহুয়া ফুলের গন্ধ।

আর জোনাকিরা আবছা আঁধারের কপালে টিপ পরাচ্ছে, টিপ-টিপ চন্দন।

একটুকরো চাঁদ লুকোচুরি খেলছে পাতায় পাতায়।

সেই মাঝরাতে এলো বসন্তপরী।

এসে বললো, কী, এতোদিনে মনে পড়লো পুরোনো বন্ধুকে! রাজা মশাই?

সেদিন থেকে পলাশের রাজ্যে বসন্ত আর ফুরোয় না।

চারদিক ফুলের গন্ধে মশগুল হয়ে থাকে।

পলাশেরও খুশীতে যেন ধরে না।

এইভাবে দিন কাটে, রাত কাটে। বছরের পর বছর ঘুরে ঘুরে যায়।

এইভাবে বসন্তের বন্যায় চারদিক ভাসে। দিন কাটে, রাত কাটে।

গোলাপপুকুরে চান করে আর বসন্তপরীর সংগে গল্প করে করে সুন্দর আছে পলাশ।

আর ডাবাড়ি?

তারপর কী হলো।

একদিন।

ডাবাড়ি এসে বললো, শুনেছো কাণ্ড? সংসার যে গেলো-গেলো।

সে কী? বসন্তপরী চোখ আকাশে তোলে। সে কী? ওমা! ও-কিছুই বুঝতে পারে না।

ডাবাডি আর কথা বাড়ালো না। কেবল দুঃখ-দুঃখ মুখে বসন্ত-পরী আর পলাশের দিকে চেয়ে থাকলো।

এমনি এক বসন্তের সন্ধ্যায় ডাক এলো বসন্তপরীর।

কিসের ডাক? না, আবার যেতে হবে। অন্য কোথাও।

কিন্তু যাই বললেই কি যাওয়া যায়? যাওয়া যায় না। তোমাকে যে কথা দিয়েছি! রাজাকে কথা দিয়ে কথা কি কেউ ফেরাতে পারে? পারে না। বলে বসন্তপরী আরো জাঁকিয়ে বসলো।

ডাবাডিও হেসে উঠলো।

হেসে গিয়ে উড়ে বসলো বেলফুলের লতানো লতায়। সে এক আশ্চর্য গাছ।

থোকা থোকা ফুল লতায়-লতায় ঝুলছে। ডাবাডির হাসিতে বেলফুলও হাসতে লাগলো।

পলাশও হাসে।

বসন্তপরীও হাসে।

সে-হাসিতে আকাশ-বাতাস খুশীর ঢেউয়ে দোলে।

বসন্তপরীর হাসিতে ফুলের মেলায় বেলোয়ারি ঝাড়ে ঝাড়ে যেন বাতি জ্বলে ওঠে।

তখনো ভোর হতে আরো কিছু বাকি।

পক্ষিরাজ একটু দম নিয়ে বললো, ঠিক সেই সময় আমরা এসে পৌঁছুলুম ধনেশের ফটকে।

ঠিক সেই সময়।

আর তক্ষুনি কোঁ-কোঁ করে মোরগ ডেকে উঠলো।

ডেকে উঠলো তো কী? চলো, চলো—ভেবো না।

রাজকুমার বললো. মোরগ-ডাকা মানেই তো ভোর। এঃ—সব পণ্ড হলো!

হ্যাঁ, বলেছে তোমাকে! ভোর না হাতি! ধনেশের ঘরে রাত না ভোর দেখবে এসো।

বলে আমরা গুটি গুটি এগোতে থাকলুম। পাছে শব্দ-টব্দ হয়ে সব না ভণ্ডুল হয়ে যায়।

সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি আকাশ-মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছড়িয়ে আছে ধনেশের ফটক।

দেখে দারুণ ঘাবড়ে গেলুম।

অতো প্রকাণ্ড লোহার গেট কে-যে তৈরী করে দিয়েছে। উঃ।

সেই ফটকে ইয়া প্রকাণ্ড একখানা তালা, তালা তো নয়, যেন লোহার তালদিঘী, কোন জন্মের পাপে তালা হয়ে ঝুলছে!

পক্ষিরাজের কথার ধরণই ওই রকম। শুনে কেউ না-হেসে পারে!

আর সেই তালাটা কি যে-সে জিনিস? তার যেন তিনশোটি চোখ সারা শরীর জুড়ে।

আমরা কাছে যেতেই ঝনঝনিয়ে উঠলো।

আর তালা ঝনঝনাতেই ভেতর থেকে বাজখাঁই গলায় ধনেশ চেঁচিয়ে উঠলো। কে রে? ধনেশের গেটে শ্বাস ফেলে?

উরেব্বাস! এইবার গেলুম। রাজকুমার ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে খিমচে ধরলো। এইবার সেরেছে! কই, কিছু একটা বলো!

আমি বললুম, বারে, আমি বলবো কী? পক্ষিরাজ হই আর যেই হই, আসলে তো আমি একটা ঘোড়া, না কী? ঘোড়ার চিঁ-হিহিহি শুনে বুঝে ফেলবে না? ধনেশের যে কী বুদ্ধি তা তো জানো না!

রাজকুমার গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো।

ভাববার সময় যেন আর পেলে না, বোকারাম। পক্ষিরাজ বললো রাজকুমারকে।

এদিকে রাত যে ভোর হয়ে যায়-যায়, তার খেয়াল আছে?

ধনেশ আবার ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচিয়ে বললো, কে রে? ধনেশের ফটকে ফিসফিসোয়? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!

বলে খড়খড় করে যেই উড়তে যাবে তক্ষুনি রাজকুমার বললো, আমি পরীর দেশের রাজকুমার।

তা বেশ, পরীর দেশের রাজকুমার। কিন্তু কী চাই তোমার? বললো ধনেশ।

রাজকুমার বললো, আমি যাবো পলাশ সিংহের রাজ্যে।

সেখানে গিয়ে?

সেখানে আছে বসন্তপরী। তার সংগে আমার কথা আছে।

বটে, বটে! তা, দাও দি'নি আমার কথার জবাব! বলে এক এক করে সব জিজ্ঞেস করতে লাগলো! বাপরে, কী সাংঘাতিক খটোমটো কথা সব! যেন সংস্কৃত আর কি, চালভাজা ছোলাভাজা কড়কড়িয়ে চিবোচ্ছে!

কিন্তু রাজকুমারও তো কম যায় না। সেও এক এক করে সব কথার জবাব দিয়ে দিলো।

আর যেই না জবার শেষ, অমনি ঘড়াং করে গেট খুলে গিয়ে পলাশের রাজবাড়ির চূড়োখানা ঝিকিয়ে উঠলো আবছা-আবছা আলোয়।

আর আমি?

পক্ষিরাজ বললো, অমনি আমি চোখের পলকে রাজকুমারকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলুম।

ধনেশের ফটক আবার ঘড়াংঘড় করে বন্ধ হয়ে গেলো।

পূবের আকাশে সূর্য তখন উঠি-উঠি।

ধনেশ আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে চলে গেলো।

জয় বললো, তারপর?

পক্ষিরাজ বললো, তারপর আবার কী!

বেলুনবুড়ো সাদাদাড়ি ঝাঁকিয়ে বললো, তারপর আবার কী? আচ্ছা বোকা তো! তারপর জানো না? তারপর। এবং তার পরের পর। শেষ নেই। কী, ঠিক কি-না হে পক্ষিরাজ?

পক্ষিরাজ বললো, ঠিক। আবার ঠিকও না। সে তুমি বুঝবে না। তার চে, দাও দিনি আরো ঢুটো কাবলী-ছোলার স্পেশাল ঘুগনি।

ঘুগনি খেতে খেতে পক্ষিরাজ বললো, তারপর রাজকুমারের সংগে দেখা হলো বসন্তপরী আর পলাশের।

ওরা তখন টগরবনে লুকোচুরি খেলছিলো।

রাজকুমার বললো, বসন্তপরী, ডাক এসেছে, এবার যে তোমাকে যেতে হবে!

বসন্তপরী বললো, কী করে যাই? আমি যে রাজার কাছে কথা দিয়েছি। আমি গেলে ওর বসন্তও যে ফুরিয়ে যাবে! তা হয় না, হতে নেই। আমি যে রাজার কাছে কথা দিয়েছি!

রাজকুমার তখন পলাশের কাছে গিয়ে বললো, ওঃ, এই বুঝি রাজা?

বলে যেই না ওকে ছুঁয়েছে, অমনি, কোথায় কী! সিংহপলাশ আবার রাজপুত্তুর পলাশ হয়ে গেলো!

তার ডাগর চোখে নীল আলো, কোঁকড়া চুলে নাগকেশরের গন্ধ আর চওড়া বুকে সূর্যের ছায়ায় সিংহরা খেলছে! সাহস ও বীরত্বের সিংহরা।

পলাশ ডাবাডিকে নিয়ে ফিরে এলো নিজের দেশে, ক্ষীরসাগরে।

পক্ষিরাজ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বললো, এবার ঢু দণ্ড গড়িয়ে নিতে হবে ভাই। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই—তিন ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে যে একটু ঘুমোবো তারও উপায় নেই। কতো আর সইবে বলো—শত হলেও ঘোড়ার শরীর তো!

তারপর একটু থেমে বললো, আচ্ছা, একটা ঠোঙায় দাও তো ক'খানা পেস্তাওলা বরফি। ঘরে নিয়ে যাই—হঠাৎ যদি রাজকুমারের তলব পড়ে গালে দিয়ে জল খেতে হবে।

পক্ষিরাজ ঠোঙা-ভরা বরফি নিয়ে টগবগিয়ে চলে গেলো। হঠাৎ নীল আকাশে যেন একরাশ কাশফুল ছড়িয়ে দিলো কেউ।

বেলুনবুড়ো বললো, এই বেলা দোকান গোছাতে হবে ভাই। মনে আছে তো, কাল হলো চাঁদপুকুরের মেলা ?

আমি বললুম, তা আর মনে নেই ? কী যে বলো ! খরগোস আর হরিণদের মেলা।

বেলুনবুড়ো বললো, সবচেয়ে আসল খরগোসটি আসবে চাঁদ থেকে। সে থাকে চাঁদে।

আর হরিণ ? জয় বললো।

হরিণদের সর্দারটি আসবে এক বরফের দেশ থেকে, যার নাম উত্তর মেরু। ওরা এলেই মেলা স্থরু হয়ে যাবে।

এই বলতে না বলতেই দেখি দূরের কালো পাথরের ফোয়ারার পেছন থেকে কুট্টুস কুট্টুস করে বেরিয়ে এলো এক দংগল খুদে খুদে খরগোস।

খাড়া খাড়া কান, টকটকে লাল চোখে দুষ্টুমী। কেউ ধোঁয়াটে ছিটেল, কেউ ধবধবে সাদা। সামনের দুটো দাঁত ঝকঝক করছে।

বেলুনবুড়ো ব্যস্ত হয়ে বললো, এই রে, এই যে এবার আসতে শুরু করেছে ব্যাটারা।

তার পর জোরগলায় হেঁকে বললো, এই যে, এদিকে এদিকে। একাত্তর নম্বর সর্ষে কাজুবাদাম বিষ্ণুশর্মা।

ডাক শুনেই একাত্তর নম্বরের খরগোসরা পিলপিল করে আসতে স্থরু করলো আমাদের দোকানের দিকে।

আমি বললুম, কী আশ্চর্য নাম ! সর্ষে কাজুবাদাম বিষ্ণুশর্মা !

বেলুনবুড়ো দুলে দুলে হাসতে লাগলো।

জয় বললো, সর্ষে আর কাজু না হয় বোঝা গেলো, বিষ্ণুশর্মা কেন ?

ওঃ হোঃ হো ! এরা হলো সেই হেরো খরগোসের বংশ !

হেরো খরগোস ? সে আবার কী !

ওই যে গো, যারা কচ্ছপের সংগে রেসে হেরেছিলো, টানা দৌড়ের রেসে ? মনে নেই ?

মনে পড়লো গল্পটা।

তিন লাফে খরগোস অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ভাবলো, এই বেলা জিরিয়ে নিই খানিকক্ষণ। কচ্ছপ ব্যাটার তো গড়াতে গড়াতেই ন'মাস!

এই বলে গাছের ছায়ায় বসে জিরোতে জিরোতে ঘুমিয়েই পড়লো।

আর এদিকে হচ্ছে কী?

গড়াতে গড়াতে কচ্ছপ এসে বুড়ি ছুঁয়ে দিলো খরগোসের আগে!

খরগোস টানা দৌড়ের রেসে হেরে গেলো।

সেই থেকেই হেরো খরগোস।

ওদেরই বংশ এরা।

কেউ সাদা। কেউ ছিটেল মেটে। হয় না? যেমন এক ভাই ধুলোটে, অন্য ভাই ঝাঁ-চকচকে ফর্সা। সেই রকম।

খাড়াকানদের একজন তখন বেলুনবুড়োর দোকানে ঢুকে এ-বস্তা ও-বস্তা করতে লাগলো। বললো, কচি দুর্বো চাই, মুগের কল চাই। আর চাই ফুলকপির পাতা আর ভেজা গম।

আছে না নেই, বলো শিগগির করে।

বেলুনবুড়ো বললো, দলে ক'জন?

তিনশো সাতাশী। এই বেলা। দুটো পঞ্চাশের গাড়িতে আরো আসছে পাঁচশো একুশজন। মোট ক'জন হলো? ছেলেবুড়ো আণ্ডা-বাচ্চা এয়োতি পোয়াতি নিয়ে?

বেলুনবুড়ো চকখড়ি নিয়ে মেঝেতে আঁক কষতে লাগলো।

আর কষছে তো কষছেই—আঁক আর কিছুতেই শেষ হয় না। শেষে বিরাট ভোস্ করে শ্বাস ফেলে বললো, এ-তো সোজা ব্যাপার নয়—ত্রৈরাশিকের নিয়মে এগিয়ে তারপর দশমিক করতে হবে। তারপর সিঁড়িভাঙা। বুঝলে? তারপর একটু থেমে আবার ঘাম মুছে বললো, নাও, নাও, এবার তো খাওয়ার ল্যাঠাটা চুকুক। কী বলো হে, এ্যাঁ?

খেড়ে খরগোস দাঁত বের করে এক গাল হেসে বললো, যা বলেছো! তারপর লাইন বেঁধে সবাই ভোজে বসলো।

বেলুনবুড়ো বললো, কী, হবে নাকি দৌড়ের বাজীটা একবার?

খেড়ে বললো, বাজী? না, না বাপু, আমরা ওতে নেই। তার চে' বলো তো দাবা কি পাশা এক হাত হলেও হতে পারে!

তিনতাসী চলবে?

চলবে।

আছি-আছি, নেই নেই?

প্রথমটায়। শেষেরটায় না। কিন্তু তাও তো এখন না, তরশুর পরের দিন, নরশু। কী, রাজী?

কাল মেলা। পরশু উল্টো মেলা। তরশু খিঁচুড়ি পরব।

আমি বললুম, উল্টো মেলাটা কী রকম?

বেলুনবুড়ো বললো, তোমাদের যেমন উল্টোরথ। সেই রকম।

আর খিঁচুড়ি পরব?

খিঁচুড়ির নামে জয় চনমন করে উঠলো।

আর ইলিশমাছ ভাজা গরম-গরম। আঃ—

বেলুনবুড়ো বললো, এটা এবার নতুন শুনছি। দেখাই যাক না কী হয়।

আমরা যেমন কথা বলছি, অমনি দলে-দংগলে খরগোসরা আসতে লাগলো এখান-ওখান থেকে, আদাড়-বাদাড় থেকে। এক-একজন করে খেড়ে সর্দার আর অনেকগুলো কাচ্চা বাচ্চা, মা-মাসী, খুড়ো পিশে। আসছে তো আসছেই। কোনো দলে দশ বারো কোনোটাতে দুশো তিনশো। আর একেকটা দলের একেক রকম গায়ের রঙ। দূর থেকে অবশ্যি অতোটা কেউ বুঝবে না, তবে ভালো করে তাকালে ঠিক বোঝা যায়—কারো পাটকিলে সবুজ তাতে একটু একটু নীল, কারো হলদেটে সাদা তাতে ডুমোডুমো ধোঁয়াটে টিক্‌লি।

একেক দলের একেক রঙ। আর নম্বর। বেলুনবুড়ো দেখেই চিনতে পারে সবাইকে।

আর দেখেই ডেকে চলেছে, দুশো একাশী নম্বর গোলমরিচ। সাতশো সাতান্ন নম্বর ঈশপ, ছ'শো তিন এণ্ডারসন কিংবা তিন হাজার পাঁচশো সতেরো নম্বর হাওয়াই ডিগডিগ গ্রীম ভাই!

এলাহি কাণ্ড একখানা!

আর এসেই যে-যার পছন্দ মতন খাবারের হুকুম করছে।

কিন্তু অতো হাজার হাজার খরগোস হলে কী হবে, কোনো চীৎকার চেঁচামেচি নেই, নোংরা-টোংরা ফেলা নেই, কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি নেই। সবাই পরিপাটি। আর বেলুন হাতে নিয়ে যে-যার দেশের গান গাইছে সুর করে।

একজন কালো মতো সর্দার, বারো নম্বর সুতানুটি ফুল-কদমা, আমাদের দেখে বললো, তোমরা কারা ভাই? দেখিনি তো এর আগে কখনো?

আমি বললুম, এই প্রথম আসছি। তুমি বুঝি হরবছর আসো এই চাঁদপুকুরের মেলায়?

হ্যাঁ। সেই কবে থেকেই তো আসছি। সেই যেবার পদ্মপুকুরের লখিনী এলো রূপকুমারের রুপোর গাড়িতে করে—সেবার প্রথম এসেছিলুম।

আমরা অবাক হয়ে গেলুম। বলে কী!

লখিনী? তুমি লখিনীর কথা জানো? লক্ষ্মণদাদা যার কথা বলেছিলো?

খরগোস বললো, লক্ষ্মণ? কোন লক্ষ্মণ? রামায়ণের না কটকের?

জয় বললো, সেই যে, যাদের গাঁয়ে সবচেয়ে লম্বা সুপুরী গাছটা পৃথিবীর? সেই।

ও! বুঝেছি। বলে মুচকি হেসে খরগোস বললো, ও আর কতো জানবে? জানে ওদের তেকাটি বুড়ো। না আছে বয়সের

গাছ পাথর, না আছে কথার শেষ। সে তো সব জেনেই আসছে সেই কবে না কবে থেকে। ও হলো লখিনীর বন্ধু।

লখিনীর বন্ধু?

হুঁ। কেন, জানো না তোমরা? দেখোনি লখিনীকে কখনো? এসে অবধি?

সে কী?

আমরা অবাক হয়ে চুপ চাপ হয়ে থাকলুম। কই, নাতো!

হঠাৎ এমন সময় আকাশের চাঁদ যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। মনে হলো একসংগে অনেকগুলো হ্যাজাক কেউ যেন তুলে ধরলো চোখের সামনে—এতো আলো! কিন্তু সে কেবল একটি পলকের জন্যে।

তারপর চোখের পাতা খুলে দেখি আমাদের চৌরাস্তার মোড়ের বেলুনওলার দোকান-টোকান কোথায় কী, ভোঁ-ভাঁ! জয় আর আমি বকুলতলায় শুয়ে আছি। বকুল পড়ছে টুপটুপ করে। চাঁদ থেকে ঝরে পড়ছে ঝিরঝির জ্যোৎস্না। যেন শ্রাবণের বৃষ্টি। কান পাতলে সেই সব টুপটাপ ঝিরঝিরের শব্দও শোনা যায় যেন।

বাতাসে তখন মিষ্টি গন্ধরাজের গন্ধ।

আর জাফরানী রঙ নদীর পারে বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড়ে প্রদীপ জ্বলছে। আর ফিরোজা রঙ আকাশে চাঁদ হাসছে। চাঁদ ভাসছে।

দেখি সেই আশ্চর্য রঙ আর গন্ধের রাজ্যে সুন্দর একটা খরগোস। এরও কান খাড়া-খাড়া; গোলাপী রঙের ভেতরটায় সরু সরু লাল লাল শিরাগুলো পাতার জালের মতো এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে আছে। আর ঝকঝকে সাদা শরীরে চাঁদের আলো পিছলে পড়ছে।

ভারি ইচ্ছে হলো ওর গায়ে একটু হাত বোলাই, আহা, কী সুন্দর! আর চোখদুটো কী, যেন একরত্তি দুটো চুনী, ডালিমের রসে ভরা। আহা, কী সুন্দর!

খরগোস এক লাফে আমাদের একদম কাছে এসে বসলো, আর শুয়ে কেন? চলো, এবার চাঁদপুকুরের মেলা শুরু করি গে।

আমি বললুম, মেলা তো সেই সূর্যদিঘীর মাঠে, সে তো অনেক দূরে।

হ্যাঁ। তা বটে। তবে দূর হলে দূর। কাছে হলে কাছে। সে তো তোমার মনে। তাই না?

জয় বললো, লক্ষ্মণদাদার মতো কথা হয়ে গেলো আবার!

জয়ের ফোকলা দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়লো।

লক্ষ্মণ বলে, সেখানে তো দুয়ার সব সময়ই বন্ধ।

বন্ধ দেখে কেউ আর এগোয় না। ভাবে, ওরে ব্বাস, অতো বড়ো তালা ঝুলছে, এর ভেতরে ঢোকে কার সাধ্যি?

তালা দেখে, বন্ধ দুয়ার দেখে সবাই ভড়কে যায়।

কিন্তু মনে-মনে চেয়ে দেখো, কোথায় তালা? কোথায় বন্ধ দুয়ার? সবই তো হাট হয়ে খোলা পড়ে আছে আকাশ জুড়ে, সাগর জুড়ে। ঘাসের মাঠে। গাছের বনে। লতার নাচে। পাতার দোলায়। সব খোলা পড়ে আছে। মনে-মনে যদি চাও, কোথায় বন্ধ?

বলে, সেখানে গিয়ে দেখো হারিয়ে যাবার কতো রাস্তা। যেদিকে চাও, সেদিকেই যাবে। কেবল হারিয়ে হারিয়ে হারিয়েই যাওয়া।

হিসেবের পথ যে মানুষের! সেখানে হারাবে সাধ্যি কী? হারিয়ে গেলে খবর ছাপায় কাগজে। নইলে পুলিশে এসে গাড়িতে তুলে নেয়। নইলে রেডিয়োতে বলে, লম্বা-ঢ্যাঙা, দাঁত-উঁচু, বাঁ পাশের কপালে ফুটি-ফুটি জড়ুল। মাতৃভাষা সিলেটী।

না। হারিয়ে যাবার জো-টি নেই।

তবে, মনে-মনে?

লক্ষ্মণদাদার কথা মনে পড়লো।

তাই তো।

কোথায় দূর! কোথায়ই বা কাছে? সবই তো আমার মনে!

জয় বললো, এখন কী ? আগে আসুক বরফদেশের রুপোলীখুর হরিণ, তবে তো মেলা ? নাকি ?

চুনীচোখ বললো, যাঃ, ওর কি আসতে বাকি ? ও এসে গেছে সেই কখন ! আর, ও-না এলে আমি কি আসতে পারি কখনো ? পারিনে।

কেন, কেন ?

ও এসে খবর পাঠায় ওর রুপোলী খুরের শব্দে, আর আলোর ছটায়।

সেই খবর পেলে তবেই আমি আসি, তার আগে না।

চলো চলো, মেলার আবার দেরী হয়ে যাবে।

যেতে যেতে আমরা চুনীচোখের সংগে গল্প করতে লাগলুম।

সে কতো রকমের গল্প।

চুনীচোখ বললো, চাঁদ হলো ভারি মিষ্টি মানুষ। বাচ্চারা যখন ঘুমোয়, তখন মায়েরা তো সেই চাঁদেরই টিপ এঁকে দেয় তাদের কপালে চুমোয়-চুমোয়। চাঁদ-চন্দনের টিপ। আলপনার ফুলের মতো।

আর আমি তার বন্ধু।

জয় মহা ভাবনায় পড়লো। বললো, এই যে এলে, এখন ওর কী হবে ? একা-একা ?

চুনীচোখ হৈ হৈ করে উঠলো। বাঃ, চাঁদও তো এসেছে। দেখোনি ?

কই, না তো ! আমি অবাক হয়ে বললুম।

কোথায় চাঁদ এসেছে ? যাঃ—

চুনীচোখ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমার চোখে চোখ রেখে তাকালো।

বললো, ওই দেখো ! দেখছো ? রাংচিতার ফাঁকে-ফাঁকে ? দেখছো ?

দেখলুম, সত্যিই তো ! চাঁদ যেন গলানো রুপো ঢেলে রেখেছে এখানে ওখানে। কালোয়-আলোয় কী যে লুকোচুরি খেলা !

চুনীচোখ বললো, আর ওই যে নদীর জলে। পাহাড়ের বরফ-চূড়োয়। কী? চাঁদ। ছড়িয়ে আছে।

যেন রুপোলী স্বপ্ন জাদুর জাল বুনছে।

আমি অবাক হয়ে রইলুম।

জয় ঘোর কাটিয়ে শেষে বললো, তবে যে বলে আকাশের চাঁদ? একা চাঁদ—একা-একা অথৈ নীলে?

দুর! কোথায় একা? কুটি-কুটি বাচ্চাদের ঘুম-চোখে কে তবে? আর ওরা তবে কারা? নদীর জলে, রাংচিতা-কালকাসুন্দের বনে, পাহাড়ের মাথায়?

একা কি কেউ থাকে? থাকে না।

যার স্বপ্নে দুচোখ ভরা, সে কখনো একা হয় না।

লক্ষ্মণদাদা বলছিলো একদিন।

বলেছিলো, দেখছো ঘরের কোণে বসে আছে গুটিগুটি। কি পথে-পথে বনে-বাদাড়ে ঘুরছে আনমনে। ভাবছো, আহা বেচারা, খেলায় বুঝি কেউ ওকে নিলো না সাথে?

আসলে তা নয়। ওর চারপাশে তখন ছড়িয়ে আছে অগুন্তি বন্ধুরা। স্বপ্নের সাথীরা। কতো কতো! কেউ দেখতে পায় না—তবু ওরা থাকে ওকে ঘিরে। আর গল্প করে যায়, মনে-মনে।

গল্পও হয় নাকি মনে-মনে? কী কাণ্ড!

চুনীচোখ বললো, কেন হবে না?

সেই যে মশানজোড়ের ময়ূর? সবাই দেখতো গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়।

সাঁওতালের দল মাদল বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে। গান গায় টানা টানা সুরে, ফিরে ফিরে। বনের পাশে। নদীর কোলে। যেখানে হপ্তায় একদিন হাট বসে পাহাড়ের ঢাল জুড়ে।

সবাই ভাবতো, আহা, একা একা গাছে গাছে উড়ে বেড়ায় কেবল। ওর মতন দুঃখী কি কেউ আছে নাকি তিন ভুবনে!

সাঁওতালদের ছেলেটা কিন্তু চোখ টিপে হাসতো। আর কাঁচপোকা ধরতে ফুড়ুৎ করে উঠে যেতো সজনের মগডালে। সে দেখেছিলো।

দেখেছিলো, ময়ূর কথা বলে মনে-মনে।

তার পালকের ময়ূরী-নীলে সোনালী চুমকীর সাজ।

কথা বলে। আর আপন মনে হাসে ঝিরঝিরিয়ে।

কেউ কখনো তা জানতেও পারে না।

কেবল জেনেছিলো সেই আদুড়গায়ের সাঁওতাল ছেলেটি।

আর জানতো বর্ষার মেঘ। যে-মেঘের গন্ধে ময়ূর পেখম মেলে নাচে।

একা কোথায়?

একা কোথায়, যদি স্বপ্নে তোমার ভরা থাকে দুচোখ?

গল্প করতে করতে আমরা এগোতে লাগলুম।

যতোই সূর্যদিঘীর মাঠ কাছে আসতে লাগলো ততোই হাওয়ায় কেমন যেন একটা মন-মাতানো, মন-কেমন-করা গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো।

কিসের গন্ধ?

খুব যেন চেনা-চেনা লাগছে যে!

চুনীচোখ খরগোস বললো, কস্তুরী। নানা দেশের হরিণ এসেছে তো, এটা হলো তিব্বতী হরিণ, সেই যাদের মৃগনাভি থাকে, তাদের গায়ের গন্ধ।

হঠাৎ দেখি আরে?

পথে পথে কে যেন মুঠো মুঠো মণিমুক্তো ছড়িয়ে রেখেছে।

বৃষ্টির সংগে একেকদিন হয় না, শিল যেমন। কিন্তু শিল তো

নয়, ডুমো ডুমো হীরে পান্না চুনী মুক্তো—কতো কতো—চোখ চেয়ে দেখাই যায় না, আলো ঠিকরে পড়ছে, চোখ ধাধঁিয়ে যাচ্ছে।

কী আশ্চর্য ব্যাপার!

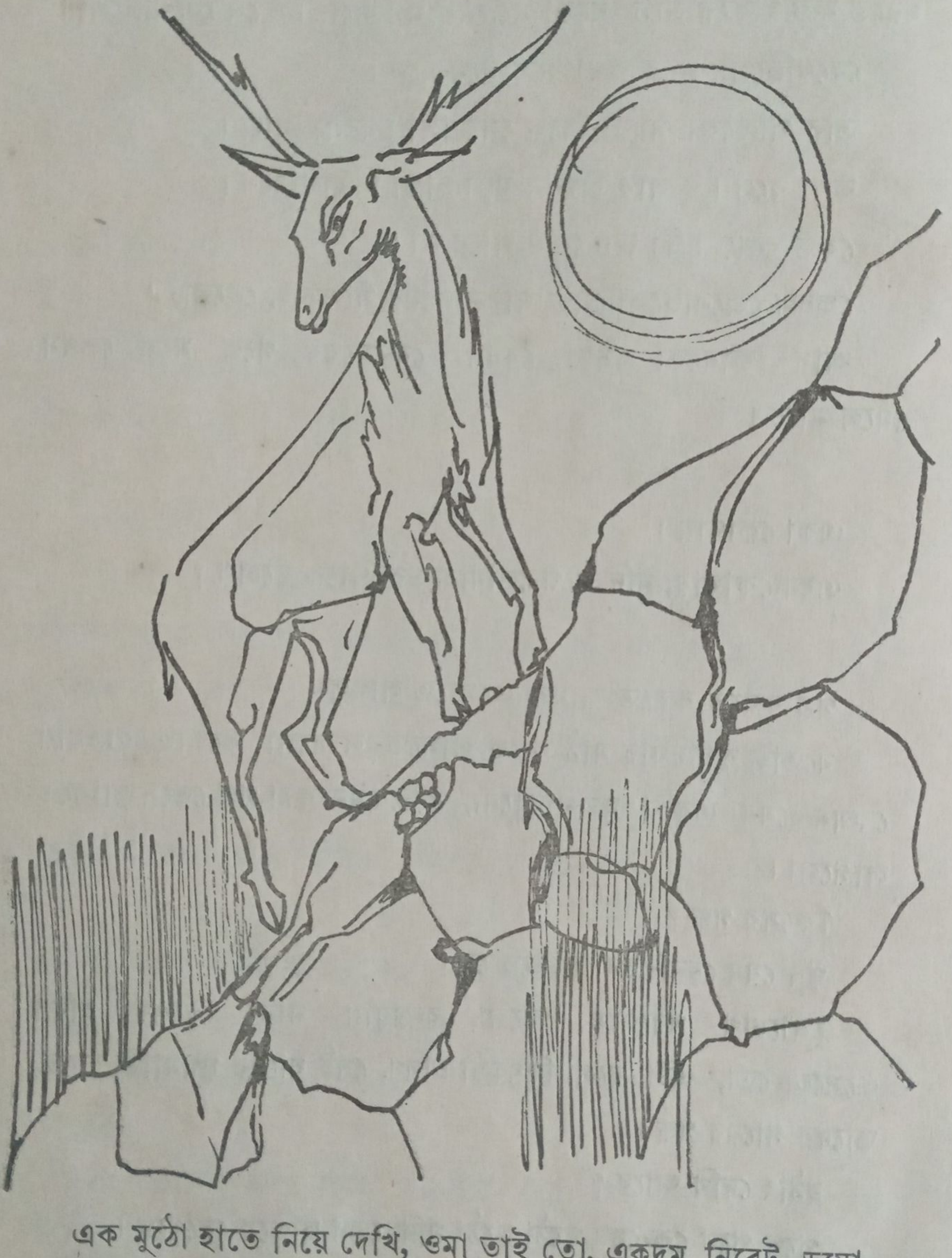

এক মুঠো হাতে নিয়ে দেখি, ওমা তাই তো, একদম নিরেট ডুমো ডুমো হীরে-জহরত, যেমনগুলো জড়োয়া গয়নায় থাকে।

আমাদের অবাক-অবাক চোখ দেখে কে না-হেসে পারবে ?

চুনীচোখও হেসে উঠলো।

জয় দুহাতে মুঠো মুঠো মণিমানিক ছড়াতে লাগলো ! আর চাঁদের আলোয় সেগুলো হাজার-মুখী তুবড়ীর মতো, ফুলঝুরির মতো, ছেলে-মানুষী খুশীতে ফুটতে লাগলো।

চুনী চোখ বললো, রুপোলীখুঁরের কাণ্ড।

সে কী ?

হ্যাঁ। তাই। ও যেদিকে যায় সেদিকেই অমনি মুক্তোমানিকের খই ফোটে। ওর রুপোলী খুরের ঘায়ে যেখানে-সেখানে সাতরাজার ধন গড়ে ওঠে।

রুপোলী খুর হরিণটা কী যে আশ্চর্য সুন্দর, দেখবে এসো।

বলতে বলতেই আমরা সূর্যদিঘীর মাঠে এসে গেলুম।

সে কী মাঠ !

যেদিকে তাকাও, শেষ নেই।

কতো কতো তেপান্তরের মাঠ যে তার ভেতরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে !

কিন্তু সূর্যদিঘী কেন ?

না, তার চারকোণে চার-চারটে সূর্যের মতো জ্বলজ্বলে তারা, আর ঠিক মধ্যিখানে প্রকাণ্ড একটা দিঘী।

দিঘীর চারপাশ শ্বেতপাথরে বাঁধা আর মস্ত একটা কাঁচের পাত দিয়ে সমস্তটা মোড়া।

কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় কতো রকম মাছ লুটোপুটি করছে জলে। দিঘীর কাঁচের ওপর বাচ্চা বাচ্চা খরগোসরা, হরিণরা দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে, ঝাঁপাঝাঁপি লাফালাফি করছে।

নীচে মাছ, ওপরে খরগোস আর হরিণ।

কী সুন্দর ! এমন তো কখনো কেউ দেখে নি !

সেই মেলার মাঝখানে বসে আছে রুপোলীখুর হরিণ। ফুল-পাতায় সাজানো মস্ত আসনে।

চুনীচোখ গিয়ে বসলো তার পাশে।

আর যেই না বসা, অমনি মেলা শুরু হয়ে গেলো।

রসুনচৌকিতে শানাই বাজলো।

আকাশ আলো করে নানারঙের আতসবাজী জ্বলে উঠলো। আর যেই আতসবাজী জ্বলছে অমনি সূর্যদিঘীর আলো কমছে। নইলে কেউ যে তা দেখতেই পেত না।

পরীরা আসছে, যাচ্ছে। যাচ্ছে আসছে।

কেবলই ছোটাছুটি, কেবলই ছোটাছুটি।

কারো কারো বুকে ব্যাজ!

এরা হলো ভলান্টিয়ার।

জয় বললো, ঠিক যেন কোলকাতার পূজোবাড়ি। যেন প্রকাণ্ড ঈদের মিলাদ। কিন্তু, কী কাণ্ড, মাইকে কেবলই হারিয়ে যাওয়ার নোটিশ তো নেই!

তাই, কোলকাতার মতো কেবলই মায়ের হাত ধরে ধরে হাঁটতেও হচ্ছে না এখানে।

এমন সময় পূবের আকাশ আলোয় নাইয়ে পরীদের রানী এলো। বসন্তপরী।

ভলান্টিয়ার পরীদের পাখায় সর-সর শব্দ।

আর শানাই।

একদিকে আতসবাজীর আলো। অন্যদিকে পরীদের ঝিলমিলে গায়ের রঙ।

বসন্তপরী সেজেছে আজ কুমকুমরঙ পোষাকে।

তার মাথায় মুকুট। সারা গায়ে গয়না।

ফুলের গয়না মণিমানিকের গয়নাকে হার মানায়।....

পরীর দেশে যে-ই আসুক, সবাইকেই একবার রানীর সংগে দেখা করতে হয়। এইটেই নিয়ম। তাই রানী আসতেই খাড়াকান খরগোস আর নানান জাতের হরিণ, হাঁস পায়রা শামুক ঝিনুক সবাই, সবাই ছটফট ছটফট করে উঠলো। এবার যারা প্রথম এসেছে, তাদের অবাক মুখ। আমাদের মতো।

দেখে দেখে যেন আশ মেটে না।

মেলা এদিকে জমে উঠছে ক্রমে।

অতিথিরা আসছে যাচ্ছে অবিরাম।

ভীড়ে ভীড়ময় চারদিক।

নাগরদোলা ঘুরছে বনবনিয়ে।

তেলেভাজার দোকানে ছ্যাকছোঁক, ছ্যাকছোঁক।

পাঁপড়ওলা উনুনে সেঁকছে পাঁপড়।

জিলিপিওলা তেকোণা ঠোঙায় করে জিলিপি দিচ্ছে—যার যতো চাই।

একদিকে বসেছে কাঁচের গয়না আর পুঁতির মালার দোকান।

অন্যদিকে মুখোসপরা জাদুকর ভেঁপু বাজাচ্ছে গাল ফুলিয়ে।

আর সব ছাপিয়ে পরীরা উড়ে উড়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। সব রঙ, সব গন্ধ, সব শব্দের ভেতরে ভেতরে। স্বপ্নের ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে।

এই সব অবাক হয়ে দেখছি।

জয় বললো, চল একটু ঘুরেটুরে দেখি। বিরাট মেলা, আদি-অন্ত নেই। যেদিকে চোখ ফেরাও, সেদিকেই কিছু না কিছু একটা হচ্ছে। কিন্তু কোনো গোল নেই, চিৎকার চেঁচামেচি নেই, কোলাহল নেই। সবাই যেন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর হয়ে রয়েছে।

জয় আর আমি হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেলুম পশ্চিমের ফুল-বাগিচায়। সেখানে ডেইজীরা ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

চন্দ্রমল্লিকাদের পাশে রয়েছে পিটুনিয়া, গ্লাডিওলাসের পাশে রয়েছে জিপসী। ব্লুবেল আর লাইলাক ভাসিয়ে দিচ্ছে রঙের বন্যায়।

জয় হঠাৎ বলে উঠলো, ওই দেখ—ওই

দেখি সেই সব আশ্চর্য বিলিতী ফুলের বাগান আলো করে হুল্লোড় করছে ক'টি আশ্চর্য ছেলেমেয়ে। আমাদেরি মতন বয়েস। দেখে মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন দেখেছি।

ভাবছি। ভাবতে ভাবতেই দেখি আমাদের কাছে কাছে দুজন সায়েব। বললো, চেনো না? হান্‌জেল, গ্রেটেল, সিন্‌ডারেলা। সবাই এসেছে মেলায়।

সিন্‌ডারেলা? আশ্চর্য! ওর পায়ে সুন্দর রঙিন জুতো।

আর এই যে ভুঁড়ি উল্টে শুয়ে আছে চিৎপাত?

বললো আরেক জন সায়েব। ও হলো গালিভার!

আমরা দৌড়ে ওর কাছে যাচ্ছি, এমন সময় হান্‌জেল এসে বললো, ওই যে সোনালী চুলের মেয়ে, ওই হলো রাপুনজেল। মনে পড়ে?

রাপুনজেল আর ছোট্ট রাজকুমার বসে আছে পাশাপাশি।

আমি ওর লম্বা সোনালী চুল ছুঁয়ে দেখলুম, সিল্কের মতো। তার থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। রাজকুমার বললো, চুল তো নয়, ডাইনীর সিঁড়ি!

আমরা হেসে উঠলুম।

জয় বললো, শেষে ডাইনীটার কী হয়েছিল রে রাপুন?

রাপুন বললো, তা আর কে দেখতে গিয়েছে! ওরা হয়তো জানে, সেই ওরা।

বলে রাপুনজেল সায়েব দুজনকে ডাকলো।

এমন মজার সায়েব কেউ দেখেনি। দুই ভাই ওরা। ঢোলা পাজামা। মুখে মুচকি হাসি। আর চোখগুলো স্বপ্ন আর দুষ্টুমীতে ঠাসা।

রাপুনজেল বলে, ও ভাই গ্রীম, বলো না, কী হলো তারপর ?

হলো আবার কী ? বললো গ্রীম ভাই। শীতের আগে ক'দিন জোর মূলোর তরকারি খেলো পেট পুরে। তারপর আসল শীত পড়তেই সাত হাত বরফের তলায় বন্দী। অতো বরফ সরাবে কে ? তাই এখনো সেই বরফের তলায় চাপা পড়েই আছে বোধ হয় ! বলে হাসতে লাগলো।

এমন সময় হঠাৎ দেখি কোত্থেকে না কোত্থেকে ঘুড়িবুড়ো এসে হাজির।

কী হন্তদন্ত ভাব !

টুপিখানা কোথায় গেলো হে ঘুড়িবুড়ো ?

ঘুড়িবুড়ো বললো, কে জানে কোথায় ! যা শনশন, শনশন, মাথায় টুপি রাখা কার সাধ্যি !

অ্যাঁ ? তাই বুঝি !

কে ?

দেখি হাওয়াপরী চোখ পাকিয়ে ঘুড়িবুড়োর মুখে তাকিয়ে আছে।

ঘুড়িবুড়ো লজ্জা পেয়ে বললো, আরে বাবা তুমি চটছো কেন ? সে কি তোমার দোষ ?

সে ব্যাটা হনুমানের দোষ ! হলো তো ?

হাওয়াপরী খিলখিল করে হেসে উঠলো। তাতেই আমরা সবাই প্রায় উড়ে যাই আর কি !

রাপুনজেলের লম্বা চুল ঘুর্ণির মতো পাক খেয়ে উঠলো।

ঘুড়িবুড়ো মুচকি হেসে চোখ টিপে বললো, দেখলে ? এইটুকুতেই এতো !

আমরা হাসতে হাসতে সারা। হাওয়াপরী শুনতে পেল না, এই যা রক্ষে !

তারপর হঠাৎ আবার হন্তদন্ত হয়ে ঘুড়িবুড়ো বললো, এই যাঃ! কী বলতে এসেছিলুম যেন—দিলো তো গুলিয়ে।

ও হ্যাঁ, তোমরা কি হান্‌স্‌কে দেখেছো কেউ?

একজন সায়েব বললো, কখন না কখন! পুকুরের ওপাশে পদ্ম বনে বসেছিলো। দেখেছি অনেক আগে। প্রায় রাত ভোরে।

পদ্মবনে কেন? গ্রেটেল বললো।

বলতে না বলতেই বিরাট লম্বা বড়োসড়ো আরেক সায়েব এসে উপস্থিত।

খুঁজছিলে?

না। খুঁজবো কেন? ঘুড়িবুড়ো দুষ্টু হেসে বললো। ওদিকে রানী যে সেই রাজহাঁসের জন্যে হাপিত্যেস বসে আছে, তা জানো?

হান্‌স্‌—মানে ওই লম্বা চওড়া ভদ্রলোক, বললো, এই তো সেই কেলেকিষ্টি—

দেখি চমৎকার সুন্দর ধবধবে সাদা একটা রাজহাঁস হেলে দুলে আমাদের কাছেই আসছে। তার সোনালা ঠোঁট, সোনালী পা। গায়ে পদ্মরেণু মাখা। পদ্মের গন্ধে ভরপুর।

পদ্মবনে সাঁতরাচ্ছিলুম। ভারি সুন্দর। মনে হলো যেন স্বপ্নে ভাসছি। রাজহাঁস বললো।

কথা রাখো। চলো এবার, রানী তোমাকে খুঁজছে।

তখন হান্‌স্‌ তার রাজহাঁসকে নিয়ে ঘুড়িবুড়োর সঙ্গে ধুপ ধুপ পা ফেলতে ফেলতে চললো।

যেতে যেতে ঘুড়িবুড়ো বললো, বাঁশিওলা এসে গেলে আমাকে একটু খবর দিয়ো তো ভাই। ওর সংগে অনেক ছেলেমেয়ে আর ধোঁয়ারঙ ইঁদুরের আসবার কথা। রওনা তো হয়েছে সেই কবে না কবে—এখনো এসে পৌঁছুলো না! ওরা না এলে মেলা কি কখনো জমবে? যাই, কেবল বাঁশি শুনলেই কি চলবে, খেতে টেতে হবে না?

বলতে বলতে ঘুড়িবুড়ো মণ্ডপের ভেতরে ঢুকে গেলো।

ওদের যাবার পথে তাকাতে তাকাতে গ্রেটেল বললো, ওই দেখছো, বটগাছটার তলায় ?

দেখি দুজন মোটাসোটা লোক, মুখভর্তি হাবিজাবি দাড়ি, মাথাভর্তি এবড়োখেবড়ো চুল, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। আর কী প্রচণ্ড নাকডাকানি !

রাপুনজেল বললো, সেই সাতমার দর্জি যাদের হারিয়েছিলো !

একজন সায়েব বললো, হারিয়েছিলো না হাতি ! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে সেই দর্জি—

দর্জি ? মুখ সামলে কথা বলো হে সায়েব !

উরে বাবা, এ আবার কে ? জয় কানের পাশে হুংকার শুনে আৎকে উঠলো।

দেখি রোগা চেহারার ছোটোখাটো একজন, বুকের ওপর সোনার প্লেট আঁটা।

সায়েব ঘাবড়ে গিয়ে বললো, আরে বাবা, এখন তো আর দর্জি না, ছিলে সেই কোনকালে না কোনকালে। এখন তো মহারাজের জামাই। আর আধখানা রাজ্যের রাজা !

জয় একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আমিও অবাক হলুম। ব্যাপারটা কী ?

দু-দুটো প্রকাণ্ড চেহারার কুম্ভকর্ণকে এই রোগা লোকটা কব্জা করলো ?

হ্যাঁ। বুদ্ধি আছে ওর ! সেই বুদ্ধি খেলিয়েই তো ও সেই এক-শিঙা হরিণ আর বুনো শুয়োরকেও বন্দী করেছিলো !

একশিঙা হরিণ !

হ্যাঁ, অই তো, অই ওরা লুটোপুটি করছে চীনে বাদামের খেতে !

দেখি রূপকথার সেই একশিঙা হরিণ। আর বুনোশুয়োর খেলা ছেড়ে এদিকেই আসছে। তাদের সংগে এক রাজকন্যা !

সায়েব বললো, কী গো মেয়ে, এখন তো বেশ ভয় কেটেছে দেখছি।

রাজকন্যা বললো, রাতে শুয়ে আবোলতাবোল কথা বলেই তো ও সব গোলমাল করে দিয়েছিলো। ভাবলুম, শেষটায় এক দর্জির সংগে বিয়ে হলো, ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

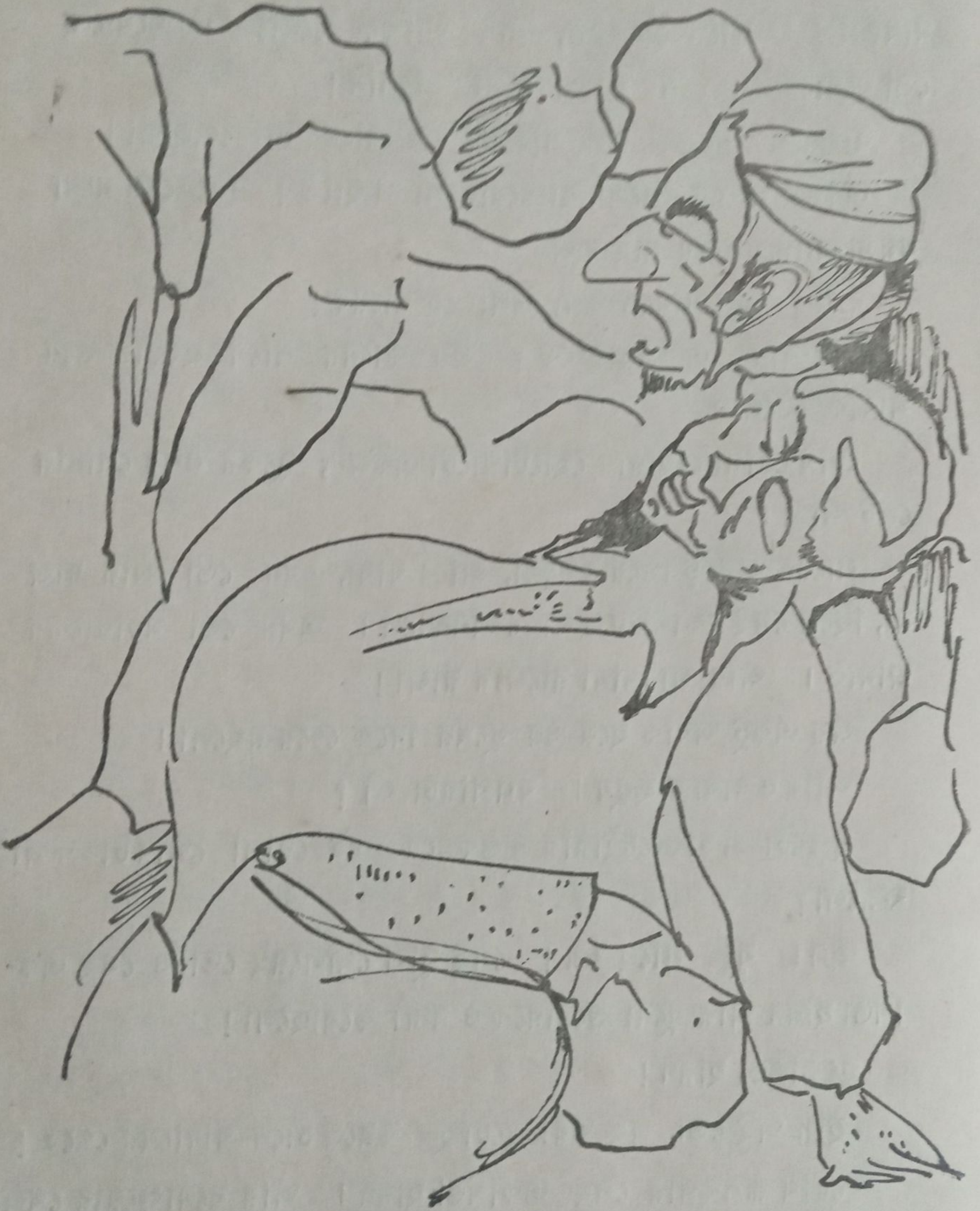

দর্জি বললো, দর্জি না থাকলে অমন সুন্দর সুন্দর জামাটামা আর পরতে হতো না! অমন কোটপ্যান্ট, গাউন ব্লাউজ! বুঝলে?

ঠিক তাই!

সায়েব বললো কুম্ভকর্ণগুলো যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বেলা পুইয়ে দিলো!

বলতে না বলতেই দেখি আরেকজন এদিকে আসছে। ইয়া পেল্লাই চেহারা, দশাসই। লম্বা লম্বা হাত পা যেন আকাশমাটি ছোঁয়া। তার পেছনে অনেক ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। ঝলমলে পোষাক, ঝলমলে চেহারা।

সায়েব বললো, এই হলো সেই হিংসুটে দৈত্য। এখন ও বাচ্চাদের কত্তো ভালোবাসে, দেখছো!

দৈত্য কথাটা আমার একদম ভালো লাগলো না।

জয়ও তাই ভাবছিলো। বললো, ওর একটা নতুন নাম দিই, এসো।

হান্‌স্ আর অন্য সায়েবরাও বললো, ঠিক বলেছো। ওর মতো এতো মজার আর এতো ভালোবাসার আর কে আছে? ও তো বাচ্চা বাচ্চা কচি কাঁচাদের জন্যে ওর সবকিছুই দিয়েছিলো। ওকে আর দৈত্য বলা ঠিক হবে না। হিংসুটে স্বার্থপর তো নয়ই নয়!

এইসব কথা হচ্ছে। সেই প্রকাণ্ড মানুষটি এক দংগল ছেলে-মেয়েকে নিয়ে হাজির।

বললো, পেন্নাম হই, মশায়েরা!

কী কথার ছিরি! পেন্নাম হই!

সিনডারেলা আর গ্রেটেল একসংগে বললো, পেন্নাম হই, মশাই। মস্ত মশাই!

বাঃ, এই তো, এই তো! ভাই গ্রীম উজ্জ্বলমুখে বললো, এই তো সুন্দর নাম হয়েছে একটা। কী গো, তোমাকে আমরা এবার থেকে মস্তমশাই ডাকি, কেমন?

ও বললো, মস্ত তো বটেই, মশাই কিনা জানিনে? বলে মিষ্টি হাসলো।

সবাই আমরা হেসে উঠলুম।

মস্তমশাই বললো, গিয়েছিলুন বরফ পাহাড়ের ওপারে। সেখানে ওই আশ্চর্য শিশুটির সংগে দেখা হলো।

বাচ্চারা সবাই মস্ত মশায়ের কোলে-কাঁধে ঘাড়ে-মাথায় উঠে পড়লো টপাটপ। আমার মনে হলো একটা প্রকাণ্ড গাছে বসন্তের ফুল ফুটলো যেন।

যাচ্ছো কোথায়?

হুই ওদিকে। দেখি গে একটু হেঁটেহুটে। আমি আবার শুয়ে বসে থাকতে পারি নে একদম। মনে হয় সবগুলো গিঁটে বাত ধরে যাচ্ছে। বাত ধরলে আর রক্ষে নেই!

যেতে যেতে হঠাৎ পেছন ফিরে মস্তমশাই বললো, কুম্ভকর্ণ ব্যাটারা কি করে যে অতো ঘুমোয়! আর নাকের কী ডাক, ডাক যেন সাগরে ঝড় উঠেছে! ওঃ!

বাচ্চারা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

অনেকগুলো জলতরংগ যেন বেজে উঠলো একসংগে।

পাখিদের কলকলানি আর ফুলের সাজে সেজে গাছটা আস্তে আস্তে হেঁটে গেলো।

হান্স ওর পথের দিকে চেয়ে বললো, আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলে আশ্চর্য!

আর ঠিক তক্ষুনি আমাদের হাত-পায়ে, এখানে-ওখানে কিচকিচ কুচকুচ করে কারা যেন কথা বলে উঠলো একসংগে। ছোট্টো মানুষ। দেখা যায় কি না-যায়।

জয় অবাক হয়ে বললো, উরে ব্বাস রে, সরে বোস, সরে বোস। মাড়িয়ে দিবি।,

আমরা সবাই একটু গুছিয়ে বসলুম।

ওরা বললো, চেনো না? আমরা লিলিপুট গো, লিলিপুট। মেলায় এসেছি।

ও হ্যাঁ, দেখেছি তো গালিভারকে চিৎপাত শুয়ে আছে। কার সংগে এলে ?

লিলিপুটরা বললো, ওর কাছেই তো ছিলুম। দেখতে পাওনি। দূর থেকে ?

রুপোলীখুর আর চুনীচোখের মেলায় এই প্রথম এলে বুঝি ?

লিলিপুটরা বললো, কতো দূরের পথ ! রওনা হয়েছি সেই কবে না কবে, পথেই কেটে গেলো চারকুড়ি বছর।

আমরা অবাক হয়ে বললুম, অতো দি-ন ! চার কু-ড়ি ?

হ্যাঁ, আর হুজ্জোতি-ঝামেলার কি কমতি আছে ! ওরা বললো। ঝড় বান খরা !

তারপর হঠাৎ কান খাড়া করে বললো, শুনছো ? শুনছো কিছু দক্ষিণের হাওয়ায় ?

আমরা অনেক কান পেতেও কিছুই শুনতে পেলুম না।

হান্‌স কান টেনেটুনে প্রায় চাপাতির মতো চ্যাপ্টা করে ফেললো, তবুও কিছুই শুনতে পেলো না।

লিলিপুটরা অবাক হয়ে বললো, কী, এখনো না ? বাঁশির সুর। ভেসে আসছে দক্ষিণের হাওয়ায়। আর তার সংগে টিপ-ট্যাপ টিপ-ট্যাপ পায়ের শব্দ। হাজার হাজার, লাখ লাখ ? না ?

ওরে বাবা, তোমরা তো দারুণ কালা গো !

এইসব হাসি ফুর্তি হচ্ছে এমন সময় সত্যি সত্যি আমরা বাঁশির সুর শুনতে পেলুম।

হ্যামলিনের সেই বাঁশিওলা আসছে বাঁশি বাজাতে বাজাতে।

পেছনে স্বপ্নের ঘোরে হেঁটে চলেছে ধোঁয়ারঙ ইঁদুর আর মিষ্টি চেহারায় অসংখ্য ছেলেমেয়ে।

বাঁশির সুরে কেমন যেন ঘুম ঘুম নিঃঝুম ভাব।

বাঁশিওলা আসছে। আসছে ক্রমেই আমাদের দিকে।

ওরা পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে শেষে মণ্ডপের দিকে যাবে।

আমি বললুম, ঘুড়িবুড়োকে খবর দিই গে।

এই বলে জয় আর আমি চললুম পূবদিকে।

গ্রেটেলরা বললো, আমরা বাঁশিওলার সংগে মণ্ডপের দিকেই যাবো। তবে কিছু খেয়ে টেয়ে নিলে হতো।

খাওয়ার কথা মনে হতেই সেখানে অনেক রকম খাবারের দোকান পটাপট ঝাঁপ খুলে তৈরী হয়ে গেলো। যেন ডুব দিয়ে উঠলো পুকুর থেকে।

বাঁশিওলা এগিয়ে আসছে আপনমনে বাঁশি বাজাতে বাজাতে।

দূর থেকে দেখি, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আর ধোঁয়া-রঙ ইঁদুর একের পর এক পা ফেলে ফেলে চলেছে ওর পেছনে পেছনে আর লিলিপুট, গ্রেটেল রাপুনজেলরা, আর সায়েবরা—সবাই ঘুম ঘুম চোখে চলেছে ওদের সংগে।

কুম্ভকর্ণরাও জেগে উঠেছে। হিংএর কচুরি আর আলুর দম খাচ্ছে গপাগপ। এই বেলা আর তো শোয়া যাবে না। বাঁশিওলা এসে গেছে যে!

পূবের মাঠে যাবো কী, তার আগেই পথে পড়লো ঘুড়িবুড়োর বেলুনের দোকান।

বললুম, এসে গেছে, অই দেখো। হান্‌জেলরাও রয়েছে ওদের দলে।

ঘুড়িবুড়ো বললো, সাত জায়গায় সাতখানা দোকান চালাচ্ছি একসংগে। ঘুড়ি বেলুন তো আছেই, আরো আছে টুপি, গেঞ্জি আর ফ্ল্যাগ-ব্যাজ! এখন নতুন একখানা দোকান করতে হলো তাতে কেবল পনির আর শুকনো মাছ।

পনির আর শুকনো মাছ, এঃ! এই দিয়েই একটা দোকান? তাই কি হয়?

হ্যাঁ। বাঁশিওলার সংগে যে ধোঁয়ারঙ ইঁদুর আসছে পনির আর শুকনো মাছেই ওদের ভোজ। আরেকখানা দোকান খুলবো কিনা

আমি তো তাই ভাবছি। আর বারে দেখেছি বস্তা বস্তা বঙ্গেডাক্ পলক ফেলতে না ফেলতে হাওয়া!

আমরা বললুম, বটে?

তবে আর বলছি কী? ঘুড়িবুড়ো বললো।

তারপর একটু আনমনা হয়ে বললো, আচ্ছা, তোমরা তো পূবের মাঠে যাচ্ছো, তাই না? ওখানে যদি খাজাঞ্চী কাকের দেখা মেলে, বলো তো আমি ডেকেছি। বাঁশিওলার ইঁদুরের হিসেবটা এখনো পাইনি! কী, মনে থাকবে তো?

বলেই ঘুড়িবুড়ো মণ্ডপের দিকে এগোলো।

সেখান থেকে বাঁশিওলার বাঁশির সুর ভেসে এলো ছাতিমফুলের গন্ধে মাখামাখি হয়ে। আমরা পূবের মাঠের পথে রওনা দিলুম।

নাম তার পূবের মাঠ। কিন্তু মাঠ কোথায়?

জয় অবাক হয়ে বললো, পূবের পৃথিবী বললেই পারতো!

প্রান্তরের পর প্রান্তর, নদী বন একের পর এক, অগুন্তি।

মরুভূমিতে ধূ ধূ করছে হলুদ বালি। ক্যাকটাসের গাছে ফুল ফুটে আছে নানারঙের।

একটা পাহাড় এমন উঁচু যেন আকাশ ছাড়িয়ে উঠছে। তার মাথায় সাদা বরফ রোদ পড়ে ঝকঝক করছে।

কোথাও শিরশিরে শীত, ঝিরঝিরে আলতো বরফ।

কোথাও ঝড়। সমুদ্রের কোণায় কোণায়। পাগলা হাতির মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

কোথাও বসন্তের কোকিল কুহু কুহু করে ডেকে আকুল।

আর কতো গাছগাছালি।

কতো রকমের জীবজানোয়ার।

পূবের পৃথিবী। সেইটেই ওর সত্যিকারের নাম হলে ভালো হতো।

জয়কে বললুম, কোনদিকে যাবি ?

যেদিকে হোক চল, সবই তো নতুন, সবই তো সুন্দর ।

একটু এগিয়েই খাজাঞ্চী কাকের সংগে দেখা। হাতে প্রকাণ্ড শেলেট আর ঠোঁটে গোঁজা পেন্সিল। মেলার সব হিসেব ওকেই করতে হয় কিনা।

খাজাঞ্চীর কাছে গিয়ে ঘুড়িবুড়োর কথা বলতেই ও হকচকিয়ে উঠলো।

আরে, আরে,—কী ব্যাপার! অ্যাঁ? বলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলো যেন।

বললো, বাঁশিওলার সুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! তা যাক, কী চাও বলো।

চাইনে কিছুই। ঘুড়িবুড়ো ইঁদুরের হিসেবখানা চাইছে।

ইঁদুরের হিসেব ? আচ্ছা, দাঁড়াও। বলে পেন্সিল দিয়ে শেলেটে আঁক কষতে লাগলো।

তারপর বললো, ঘুমের আগে পর্যন্ত ছিলো বারো হাজার সাতশো তিরেনব্বুই। তারপর ঘুমের ঘরে শূন্য। তারপর, এই নাও, পাঁচ লক্ষ আঠেরো।

মাঝখানে ?

তাই তো! মাঝখানে! বলে একদম থ হয়ে রইলো খানিকক্ষণ!

তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বললো, কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম তা যদি বলতে পারো আর ইঁদুরদের চলার গতি, গায়ের মাপ টাপ কতো তা যদি জানা যায়, আর ওরা এক লাইনে কতোজন করে হাঁটছিলো তা যদি অন্ততঃ অনুমানও করতে পারো—তাহলে এক সেকেণ্ডেই হিসেব করে বলে দিতে পারি, রাফ্‌লি।

জয় বললো, কিন্তু সে-সব কী করে জানবে ?

তাছাড়া, আরেকটা ব্যাপারও আছে। বলে গালে হাত দিয়ে বসলো খাজাঞ্চী কাক।

কী ?

আছে। দারুণ ব্যাপার। বলে মুচকি হেসে বললো, যেতে যেতে ওদের দিন যায় রাত যায়, হপ্তা যায়। মাস যায়। এর ভেতরে আরো কতো কতো নতুন ইঁদুর হয়। না? এসব অবশ্যি হায়ার ম্যাথস্। ছেড়ে দাও!

বাঃ রে, ছেড়ে দিলেই হবে? ঘুড়িবুড়ো ওদের জন্যে পনির আর শুকনো মাছের দোকান দিয়েছে না? কতোজন খদ্দের না জানলে তার কি চলে? না, না—হিসেব চাই বাবু।

তখন দেখি একজন ভদ্রলোক বেশ বড়ো সড়ো দেখতে, কোট-প্যান্ট পরা কিন্তু বাঙালী-বাঙালী চেহারা—আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তাঁকে দেখে কাক খাজাঞ্চী উবু হয়ে বসে আবার হিসেবে মন দিলো।

বাবুটি তখন একদম আমাদের কাছে এসে গেছে।

আমাদের আদর করে বললো, হিসেব? কতো চাও? এই নাও। বলে আমাদের হাতে একমুঠো লজেন্স তুলে দিলো। তার এক চোখে বিজ্ঞানের আলো, অন্য চোখে কবিতার।

তার সংগে এসেছিলো অবাক-অবাক সব জিনিস। একজন হাঁসজারু, একজন হাট্টিমা টিম টিম। আর একজন গোমড়া-মুখো। অদ্ভুত।

আমরা সবাই খুশী হয়ে গলগল করে হেসে উঠলুম, কিন্তু ওই গোমড়া মুখোটি হাঁড়িমুখ করেই রইলো।

বাবুটি মুচকি হেসে বললো, হাসবে না। ও হলো রামগরুড়ের ছানা। কিছুতেই হাসবে না।

এইসব কথা হতেই দেখি এক ঝাঁক টুনটুনি উড়ে গেলো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে।

টুনটুনি না?

দেখি ওরা গোলচক্কর মেরে উড়ছে আর বলছে, টুনটুনিতে টুন-টুনালো—চেনা সুর, চেনা কথা শুনে আমরা অনেক দিন আগের আমাদের মিষ্টি ছেলেবেলায় আবার নতুন করে ফিরে গেলুম।

জয় বললো, কতোবার কতোবার আমরা এসব শুনে শিশু হয়ে যাবো আবার। চিরকাল। একদম দোলনার দোলন চাঁপা শিশু।

আরে, কে কোথায় !

পলকেই সব হাওয়া। কোথায় গেলো টুনটুনিরা ? কোথায় হাঁসজারুরা ? অ্যা ?

আমরা আকাশের কোণে কোণে খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজতে খুঁজতেই দেখি আকাশে এক চিলেতে গালচেয় ভেসে আসছে ফেজটুপি পরা একটি ছেলে। গায়ে আতরের খশবু-মাখা মখমলের পোষাক, হাতে সোনার আশ্চর্য প্রদীপ।

এসেই খুশ মেজাজে কুর্নিশ করে বললো, আস্‌সালামু ও আলেইকুম !

আমরা কী বলবো কী করবো ভাবছি, এমন সময় লম্বা নাক রোগা ফর্সা দারুণ চেহারার এক খানদানী পটুয়া বাবু এসে বললো, ও-আলেইকুম সালাম।

আমরাও বললুম, ও-আলেইকুম সালাম।

এইসব চললো খানিকক্ষণ।

তারপর একসময় প্রদীপ-হাতে ছেলেটি বললো, তুমি কী মনে করে হে, পটুয়া ?

পটুয়া বললো, আর বলো না ! লম্বকর্ণ ব্যাটা তো চিরকাল বসে বসেই থাকে এখানে এলে, কিন্তু বুড়ো আংলাটা বেশ বাক্যি সাক্যির বাধ্য ছিলো। সে গন্ধ শুঁকে শুকে খুঁজে বের করতো আমাকে, এখন সে ব্যাটাও হাওয়া ! উফ্‌। কালে কালে কী যে হচ্ছে !

যাবে কোথায় ? বলে ফেজওলা ছেলেটি প্রদীপকে বললো, যাও তো নিয়ে এসো ওদের, যেখান থেকে পারো।

প্রদীপের ভেতর থেকে পাগড়ীপরা হাওয়া-হাওয়া এক পালোয়ান এক নিমেষে সেলাম করে বিদেয় হলো। তারপর আবার পলক

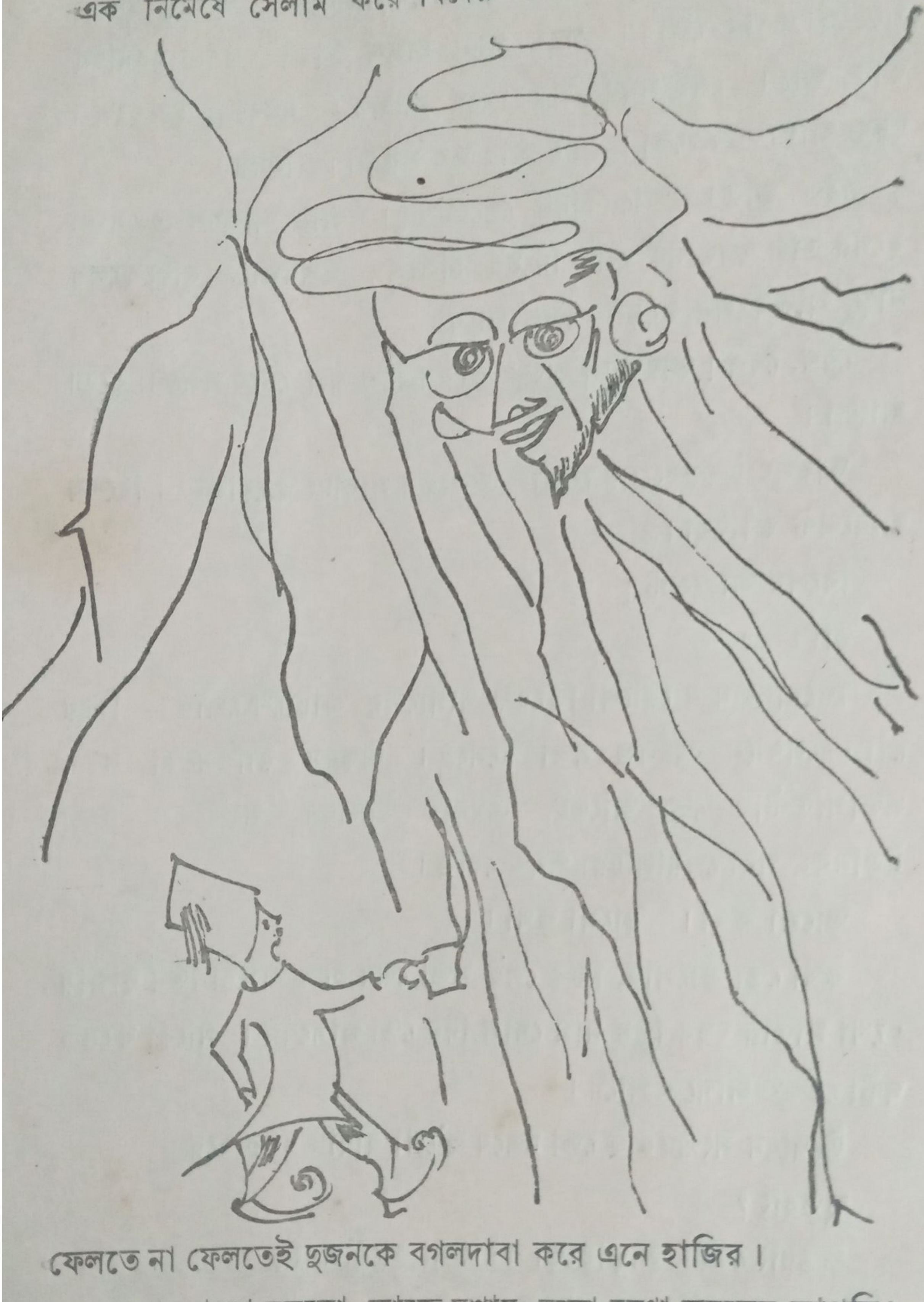

ফেলতে না ফেলতেই দুজনকে বগলদাবা করে এনে হাজির।

বুড়ো আংলা বললো, আজ্ঞে মশায়, বড়ো যন্ত্রণা করলেন আপনি। আমাদের অপরাধ ?

বটে! পটুয়া চোখ পাকিয়ে বললো, যন্ত্রণা?

নয়তো কী! গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছিলুম। গংগায় ইলিশ পড়েছে এবার জোর। গরম গরম ইলিশ ভাজা আর চামরমণির ভাত, আঃ। সেই সময় ইনি গিয়ে হাজির! যমদূতের চর হলেও দুদণ্ড অপিক্ষে করতো! এর আর তর সয় না! নির্দয়।

ঠিক হ্যায়। আরেকদিন খেয়ো'খন। আজ আলুপোস্ত সোনা মুগের ডাল আর গন্ধ লেবু দিয়েই চালাও। শেষপাতে নারকেলের নাড়ু আর নলেন গুড়ের সন্দেশ পাবে।

বেশ, বেশ! তারপর? সুড়ুৎ করে জিভে জল টেনে বললো বুড়ো আংলা।

তারপর উত্তরবংগের শেয়াল প্রকল্পের সংবাদং প্রয়োজনং। বিশেষ আরজেন্ট জানিবা।

বিশেষ আরজেন্ট!

হ্যাঁ।

গিয়েছিলুম বারোশো তিরেশী বংগাব্দের আটাশে পৌষ। গিয়ে দেখি সেখানে প্রকাণ্ড সভা বসেছে। একদম রীতিমতো সভা, সভাপতি-টতি তো আছেই, এমনকি উদ্বোধন সংগীতের জন্যে ইউনিফর্ম-পরা শেয়ালচিরা পর্যন্ত রেডি।

ভালো কথা। ভালো কথা।

কথা তো ভালোই, কিন্তু সেই সভা শেষ হতে আরো তিন হাজার দুশো সাতান্ন বছর তিন মাস ষোল দিন তো লাগবেই। আরো কয়েক ঘণ্টা বেশীও লাগতে পারে।

উদ্বোধন সংগীতটাই তো চলবে ছ'শো বাহান্ন বছর ধরে—

সুতরাং?

সুতরাং তেমন তাড়াহুড়ো করাং নং প্রয়োজনং!

আমরা সবাই হেসে উঠলুম!

ফেজটুপি পরা আলা বললো, সভা হবে আর দেরী হবে না,

তাই কি কখনো হয় নাকি ! এ সংসারে কেউ এমন দেখেছে কখনো ?

অতএব ?

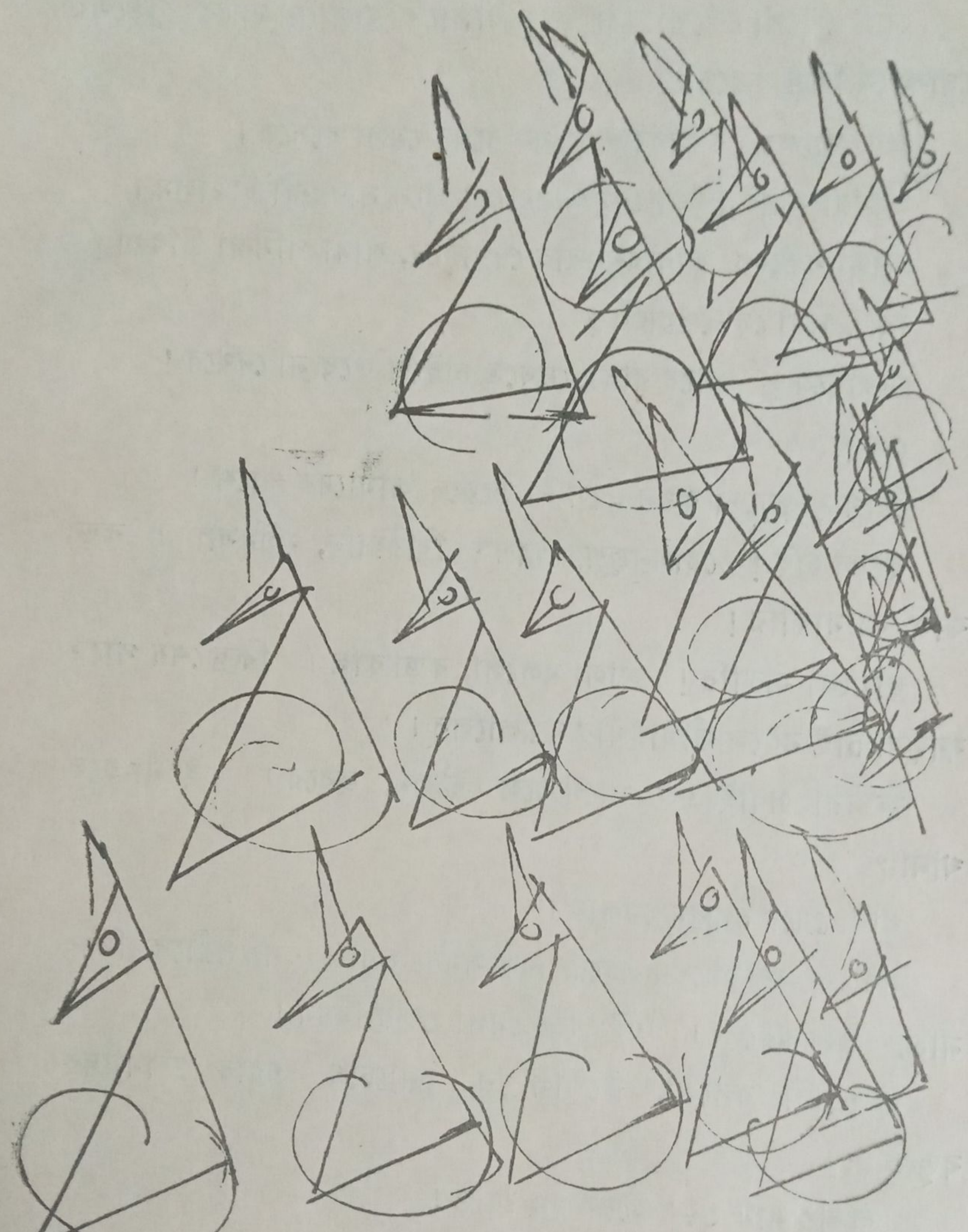

অতএব আপাততঃ দুটো তেলেভাজা খাওয়া যাক। যা ছ্যাকছোক ছ্যাকছোক চারদিকে !

দেখি চারপাশে ভাজাভুজির দোকান।

কেউ পাঁপড় ভাজছে উনুনে। কেউ গরম গরম জিলিপি ছাড়ছে রসে আর ঝাঁঝরি হাতায় করে তুলে পাহাড় করে রাখছে বারকোষে।

কেউ পেঁপোঁ পেঁপোঁ করে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে মাটির পুতুলের দোকানে ভিড় করছে।

জয় বললো, কোলকাতায় যেন রথের মেলা বসেছে।

আমরা সবাই পেঁয়াজি-ফুলুরির দোকানে সারবন্দী দাঁড়ালুম।

আলা বললো, কাবাব-টাবাব দেখছিনে, শামী পসিন্দা টিকিয়া? কি কোর্মা দো-পেঁয়াজী?

দেখছিনে! আরে বাবা, দেখতে চাইলে তবে না দেখবে!

কে?

দেখি ঘুড়িবুড়ো কখন এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে।

কতো চাই? রোগনজুশ, গোশত্ বিরিয়ানি, মুর্গমুসল্লম্। কড়া ঝাল, না মাঝারি!

ছ্যা ছ্যা মাঝারি! আলা বললো, কড়া ঝাল। কিন্তু শেষ পাতে ফালুদা চাই নইলে সীমাইখীর কমলালেবু।

আমরা সবাই এক সংগে বলে উঠলুম, হুররে। এই না হলে খানা?

খানা খেয়ে চললুম মেলায়।

সব বন্দোবস্ত শেষ করে এক সময় সবাই বসন্তপরীকে ঘিরে নাচতে শুরু করলো। এই হচ্ছে মেলা শুরুর নিয়ম।

বসন্তপরী বললো, রুপোলীখুর, চুনীচোখ—এবার তোমাদের বক্তৃতা।

বক্তৃতার নাম শুনে জয়ের মুখ হাঁড়ি।

সেই—একবার গিয়েছিলো পূজোর জলসায়।

সবাই বলে, নাচ হবে, গান হবে, ম্যাজিক হবে। কতো কী হবে। শেষে ভুঁড়িওলা জাঁদরেল একজন উঠে দাঁড়িয়ে শুরু করলো বক্তৃতা!

উঃ, সে কী ভয়ংকর বক্তৃতা, একদম শেষ নেই। কেবল কথা, আর কথা। অতো কথা কোত্থেকে যে আসে!

জয় মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকলো।

তাই না দেখে আমাদের পাশের হরিণ ছেলেটি বললো, এ কি তোমাদের মতন নাকি? দেখোই না কেমন বক্তৃতা!

জয় তাকিয়ে দেখে ওর গায়ের বাদামী লোমগুলো যেন সোনার মতো চিকচিক করছে। তাতে সাদা সাদা ফোঁটা। কচি পটলের মতো একটু একটু শিঙ কপালের দুপাশে।

জয় বললো, তোমার দেশ?

হরিণ বললো, আসামের পূবে, মণিপুর। আমার নাম ছিটন্তি।

ওর পাশেই এক সম্বর। নাকি বারোশিঙা। বাপরে, কী জাঁদরেল নাম। দেখতেও তেমনি—মাথায় ঝাঁকড়া শিঙ, যেন ডাল-পালাশুদ্ধ আস্ত একেকখানা জামরুলের গাছ!

একমনে বসন্তপরীকে দেখছে।

আমি ওকেও শুধোতে যাচ্ছিলুম কোথায় ওর দেশ।

ঠিক তেমনি সময় বক্তৃতা শুরু হয়ে গেলো। দেখি ছিটন্তি যা বলেছিলো, ঠিক তাই।

রুপোলীখুর সামনের দু-পা দিয়ে টিকটিক টুকটুক তাল দিচ্ছে আর চুনীচোখ শূন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে।

এই বুঝি বক্তৃতা!

জয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। বাব্বাঃ!

আর সেই নাচের তালে তালে মণি-মুক্তোর পাহাড় জমে উঠতে লাগলো।

ভলান্টিয়ার পরীরা যতোই সেগুলো ঝেঁটিয়ে সরায়, ততোই আবার নতুন নতুন জমে জমে ওঠে।

এই করে করে গোটা সূর্য দীঘিটা জুড়ে রামধনু রঙ মানিকের পাহাড় জমে উঠলো।

তাতে চাঁদের আলো, বসন্তপরীর গায়ের কুমকুম আর কস্তুরী হরিণের গন্ধ মিলে মিশে একাকার হতে লাগলো।

জয় হঠাৎ বলে উঠলো, ওই দেখ, ওই দেখ—ওই ওখানে!

দেখি অনেকখানি দূরে যেখানে গ্রংগাফড়িং আর কাকাতুয়াদের আসর বসেছে সেখানে কতকগুলো জরির ঝালরের আড়ালে সুন্দর টুকটুকে একটি মেয়ে বসে আছে। সোনার মতো রঙ। ঢলঢলে মুখ, টানাটানা চোখ, তিলফুলের মতো নাক। গোলাপী রঙের জামায় সোনার তারের কাজ। আলতা-পায়ে রুপোর মল।

জয় বললো, কী আশ্চর্য! কী যেন নামটা, কোথায় যেন দেখেছি!

আমি আরো ভালো করে দেখলুম। তাই তো, খুব যে চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি—ঠিক মনে পড়ছে না।

এদিকে নাচগান দারুণ জমে উঠেছে। আর রুপোলীখুরের মণিমানিকের খেলা।

কিন্তু, কী অবাক, মনটা ফিরে ফিরেই চলে যাচ্ছে ওই মেয়েটার কাছে।

এক সময় দেখি, ঝমঝম ঝমঝম করে একটা গাড়ি এসে থামলো সেই সোনাবরণী মেয়েটার সামনে। আর তার ভেতর থেকে নামলো এক পরী।

আর তক্ষুনি কাকাতুয়ারা সবুজের বান ডাকিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগলো ওদের চারপাশে।

পরী বললো, এবার চলো ওপাশে গিয়ে দেখি। সাতবামনের দল এসে গেছে।

মেয়েটি ডাগর চোখে তাকালো। 'আর রাজকুমারী?

সেও এসে গেছে কখন! চলো চলো, বেলা যে বয়ে যাচ্ছে—

মেয়েটি বললো, রূপোলীখুরের খেলা দেখবে না?

পরী বললো, কেন দেখবো না ? সে তো ওপাশ থেকেও দেখা যাবে। যেখানে চাঁদোয়ার ফুলঝুরি ঝালরের শেষ।

ছিটস্থি হরিণও আমাদের পাশে বসে এই সব শুনছিলো।

বললো, চেনো নাকি ? দেশের মানুষ ?

আমি বললুম, চেনা-চেনা ঠেকছে। কিন্তু ঠিক ঠিক নামটি মনে আসছে না।

তাই শুনে ওর কী হাসি !

বললো, সে তো তোমাদের সেই লখিনী গো! পরীদের রাজকুমার ওই দেখো, ওই দেখো, ওকে রুপোমোড়া গাড়িতে নিয়ে বেড়াতে বেরোলো!

•

লখিনী! লখিনী!

সেকি, সে তো অনেক দিনের কথা। বলেছিলো লক্ষ্মণদাদা। সে তো সেই কবে না কবে !

ছিটন্তি বললো, পরীর দেশে এসে কারো সময় খোওয়া যায় না। যে-যেমন, সে-তেমনি থেকে যায়। চিরকাল।

তারপর একটু থেমে বললো, ও হলো লখিনী, আর, ওই যে দেখছো রামধনুরঙ মুকুটপরা, মাজা মাজা রঙ গায়ের—সেই হলো পরীর দেশের রাজকুমার।

জয় বললো, আহারে, লখিনীর সংগে দেখা হলে বেশ হতো !

ওমা, বলতে না বলতেই দেখি রুপোমোড়া গাড়ি নিয়ে পরীদের রাজকুমার একদম আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো !

লখিনী বললো, কী গো বাছা, বড়ো যে আমাকে দেখতে চাইছো ? কী ব্যাপার ?

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

মুখে যে আর কথা সরে না !

স্বপ্ন তো নয় ! এই তো বেশ জেগে আছি ! না, না—স্বপ্ন তো নয় !

আমি লখিনীর মুখের দিকে তাকালুম।

শ্রাবণের পুকুরের মতো ঢলঢলে মুখে যেন সমস্ত পৃথিবীখানা ছায়া ফেলে রয়েছে। সুখের। আনন্দের।

অতসী ফুলের মতো গায়ের রঙ, পলাশের মতো চোখ, তিলফুলের মতো নাক।

আর রাজকুমার ?

যেন কিশোর এক নারকোল গাছ। পাতায় পাতায় চন্দ্রসূর্য ঝিকিয়ে রয়েছে। লখিনীর পাশে দাঁড়িয়ে ও মিটিমিটি হাসছে, মুখ টিপে।

আমি ঘোর কাটিয়ে বললুম, তাহলে লক্ষ্মণদাদার কথা সত্যি ?

লখিনী হেসে উঠলো।

তার হাসিতে মুক্তো ঝরে, হাওয়ায় লাগে পদ্মগন্ধের মাতন।

লখিনী বললো, লক্ষ্মণ কি আর নতুন কিছু বলবে ? সেই পুরোনো দিনের গল্পটা তো ? তাই না ?

জয় বললো, হ্যাঁ, সেই পুরোনো দিনের কথাই। সেই যেদিন হঠাৎ এলো প্রজাপতি পাখার রুপোলী গাড়ী। পদ্মপুকুরের ঘাটে।

আর হঠাৎ হারিয়ে গেলো বটের শেকড়ের তলায়। কোথায় না কোথায়।

লখিনী বললো, হারিয়ে তো আর যাইনি সত্যি সত্যি ! এই তো দেখছো, দিব্যি রয়েছি এখানে।

তা বটে। আমি বললুম। তা বটে। কিন্তু আর যে গেলে না দেশের গাঁয়ে ?

লখিনী হাসি চেপে বললো, কী করে আর যাই বলো ! এই যে রাজকুমার, কিছুতেই যেতে দিলো না যে !

রাজকুমারের ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। যেন কৃষ্ণচূড়ার পাতায় একাদশীর চাঁদ লেগে রয়েছে একটুখানি।

বললো, যেতে দিলেই যেন যাওয়া যায়? রূপকথার দেশে এসে যার ভাব হয় পরীদের রাজকুমারের সংগে, তার আর যাওয়া হয় না যে !

আমি বললুম, ওর যে মা ছিলো। পৈতে কাটতো তকলিতে। ডুমো ডুমো জলপাই হতো গাছে। আর ওর বাবা—যার লম্বা সালুর

গেঁজেতে থাকতো টাকাপয়সা আর ঝোলায় থাকতো লংকা মশ্‌লা ? ওদের কী হবে ?

রাজকুমার এবার খুব হেসে উঠলো। যেন এটা একটা মজার কথা হচ্ছে। আমার ভারী রাগ হলো ওর ওপর।

বলল, ওরা তো সবই জানে। তাই ওদের কোনো কষ্ট নেই।

এঃ, বলেছে !

সত্যি তাই, রাজকুমার ব্যস্ত হয়ে বললো। সত্যি, সত্যি। পরীদের রূপকথার রাজ্যে কি সবাই চিরকাল থেকে যেতে পারে ? পারে না। তাই কেউ যদি কখনো পারে তাহলে তার জন্যে দুঃখ হতে নেই। সে তো দারুণ ভালো কথা। তাই না ?

জয়ের মন তবু ভোলে না।

বলে, দুঃখ হতে নেই ? যাঃ। তুমি আমাদের ঠকাচ্ছো !

রাজকুমার বললো, দুঃখ হতে নেই, কেন-না ওরা আসে বলেই তো পৃথিবীতে এখনো গল্প আছে ছড়িয়ে। আর কে না-জানে, গল্প ছাড়া কি কোনো মজা হয় ?

আমি বললুম, তা বটে ! লক্ষ্মণদাদা বলতো, গল্প যতো, মজাও ততো। যেখানে গল্প নেই সেখানে সব যেন সেই রামগরুড়ের ছানাটি। মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকে, আর পান থেকে চূন খসেছে কি হৈ হৈ বাঁধাচ্ছে।

লখিনী বললো, আমি কিন্তু যাই কখনো কখনো চুপি চুপি। কেউ দেখতে পায় না।

সে কি ?

হ্যাঁ। যখন যাই তখন হয় নিশুতি রাত। নয় তো ঝাঁ ঝাঁ ভরদুপুর। হয় ঝমাঝম বর্ষা, নয় তো হলুদে-সোনায় ধানখেত রমরমা। কেউ তখন দেখতে পায় না।

তবে কেন যাও ?

যাই। গিয়ে দেখি। সেই পদ্মপুকুরের ঘাট। সেই লাল শালুকের

পুকুর। সেই নলখাগড়ার বন। মাছরাঙা কাদাখোঁচা বউকথাকও। সেই নীল আকাশ, কালো আকাশ। বকের সাদা। ময়ূরের নীল। কোকিলের কালো।

দেখি। বাঙলার মাঠ বন নদী পুকুর। পদ্ম কলমী অপরাজিতা। টুনীফুল, জয়ন্তী, অশোক।

দেখি, দেখে দেখে আশ মেটে না!

তাই?

হ্যাঁ, তাই তো যেতে হয়। গিয়ে গাছে পাতায় ফুলে হাওয়ায় লুকোচুরি খেলি।

জয় বললো, শুধু তুমিই যাও, একা-একা?

দুর বোকা। লখিনী বললো। তাই হয় নাকি কখনো? রাজকুমারও থাকে সংগে। রাজকুমারের মুকুট—এই দেখো—তাতে আছে স্বপ্নের জাদু। আর এই যে এই ওর হাতের বাঁশি, তাতে স্বপ্নের গান। তার ছোঁয়ায় সবাই স্বপ্নে জাগে, স্বপ্নে ঘুমোয় ঠিক। যে যেমনটি চায়। চন্দ্র সূর্য। আলো-আঁধার। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ বসন্ত।

তারপর?

তারপর এক সংগে ঘুরে ঘুরে কথা বলি। গল্প করি পুরোনো সাথীদের সংগে।

সাথী?

হ্যাঁ। নারকোলগাছের লিকলিকে পাতায় বসে থাকা বাবুইটির সংগে। কিংবা অন্য কারো সংগে। গিরগিটি তক্ষক গোসাপ। পেঁচা পায়রা গাংশালিক। একেকদিন কাটিয়ে দিই অশ্বত্থ অর্জুন মুচুকুন্দদের সংগে। একেকদিন চলে যাই দক্ষিণে—সুন্দরবনে—যেখানে সুঁদরী কেওড়া গরান হেঁতাল নোনা কাদায় নাক উঁচিয়ে থাকে। যেখানে ডোরাকাটা বাঘ, পিঠজাগানো কুমীর। আর ঝাঁক ঝাঁক চকচকে রুপোলী ইলিশ গংগাসাগরের মোহনায়। এই সব।

আমরা অবাক হয়ে বসে রইলুম। নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসই হতো না।

বললুম, এই সব দেখো বুঝি?

হ্যাঁ। বললো লখিনী।

ধুক ধুক করে চলে যেতো কখনো ছোটো লাইনের গাড়ি আমতায় —চাঁপাডাঙায়।

ঘোমটা পরা বউরা বাসন মাজতো পুকুরের ঘাটে। আদুড় গায়ে কচিকাঁচারা হুটোপুটি করতো খড় গাদায়।

কখনো নবান্নের গন্ধে হাওয়া ম' ম'। কখনো ডাল সম্বরার পাঁচফোড়নের গন্ধে মন উতলা।

কখনো ঢাকের বাজনায় আকাশ গমগম।

আর কখনো, যতোদূরে তাকাও, সর্ষে ফুলের হলুদ মাঠে ফিরোজা রঙ প্রজাপতিদের খেলা। এইসব দেখি। দেখে দেখে আশ মেটে না।

কখনো কখনো চাষীদের স্বপ্নে-বোজা চোখে গিয়ে বসি। লাঙলের ফলায় ফলায়। কাস্তে কোদালে। লক্ষ্মীটিপ-আঁকা বলদের কপালে চুমো খেয়ে নিই। যেন ওরা সুখে থাকে। যেন ওরা সুখে থাকে। এই কথা বলি মনে মনে।

রাজকুমার বললো, লখিনীর শরীরটাই যেন ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গাটায়। তারপর মুচকি হেসে বললো, লখিনী মানে জানো তো?

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ দেখি ছোট্টো বামনদের দলটি রাজকুমারীকে নিয়ে চাঁদোয়ার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

ওদের গায়ে লালরঙের ফতুয়া। পাকা দাড়ি কাশফুলের মতো ফুরফুরে। আর মাথায় জাদুকরের টুপি।

রাজকুমারী পরেছে সোনার ফুলকাটা পোষাক।

মাথায় মুকুট।

হাতে ফুলের মালা।

আমি বললুম, ওমা, এরা আবার কোথেকে এলো?

এরা তো এখানে থাকে না। থাকে দূরের দেশে। সাগরের মধ্যিখানে ওদের দেশ।

সেখানে আছে লবংগর বন। আর আছে এলাচ, দারুচিনির পাহাড়। সেখান থেকে আসে ওরা। এসে ওদের দেশের পালা করে।

পালা? সে আবার কী? যাত্রা-থিয়েটারের মতো নাকি?

ঠিক তাই। দেখোই না কেমন মজা করবে এবার।

একেক জন একেক রকম সেজে পালা করবে। এই দেখতেই তো কতো কতো দূরের দেশ থেকে আসে সবাই।

ওদের আছে ইচ্ছের জাদু।

যখন যেমন চাইবে, তক্ষুনি সে তেমনটি হয়ে যাবে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই।

বলতে না বলতেই দেখি পরীদের রানীকে ঘিরে ওরা পালা শুরু করে দিয়েছে।

এক ছিলো গরীব ঘরের ছেলে।

ছেলে আর ওর মা; ওদের আর কেউ নেই সংসারে।

এর-ওর ঘরে কাজ করে মা ছেলেকে মানুষ করে।

মায়ের ভারি দুঃখ। কি করে ছেলেকে লেখা পড়া শেখায়, বড়ো করে গড়ে তোলে। সব কাজের মধ্যেই এই ভাবনা মায়ের মনে।

একদিন ছেলে বললো, তুমি থাকো ঘরে। আমি যাই ভিন গাঁয়ের সওদাগরের বাড়িতে কাজ করতে। আমার জন্যে ভেবো না।

এই বলে ছেলে চলে গেলো।

ভারি ভালো ওর স্বভাব। সবাই ওকে ভালোবাসে। সওদাগরের সব কাজ করে দেয় মন দিয়ে, টপাটপ। সওদাগর ওর ওপর খুব খুশী।

এই ভাবে দিন কাটে।

অনেক অনেক দিন। ছেলে এখন অনেক বড়োটি হয়েছে।

একদিন বললো, সওদাগরমশাই, এবার আমি বাড়ি যাবো। মায়ের জন্যে মন কেমন করছে।

সওদাগর ওর মাইনেকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে বললো, এই নাও তোমার প্রাইজ। আমার বাড়িতে-খামারে ভালো করে বেশী বেশী কাজ করেছো, এই তার পুরস্কার। বাড়ি নিয়ে যাও। ভালো থেকো। ভালো থেকো। ভালো দেখো। ভালো শোনো। এই নাও পুরস্কারের থলি।

তাতে ছিলো অনেক মণিমুক্তো টাকা-পয়সা সোনা-দানা।

একটা শক্ত,ভারি থলি।

খুশীতে ডগোমগো হয়ে ঝোলাভরা সোনামানিক নিয়ে ছেলে চললো মায়ের কাছে।

ও ছিলো বড্ডো ভালো মানুষ।

কিন্তু অতো ভারি বোঝা বয়ে অতো দূরের পথ কি করে যে যাবে তাই ভেবে ওর মন খারাপ হয়ে গেলো।...

যেতে যেতে দেখে একজন আসছে ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে।

কালো চকচকে ঘোড়া, যেমন তেজী, তেমনি সুন্দর।

ঘোড়সওয়ার বললো, উরেব্বাস, জোয়ান ছেলে অতো হাঁপায় নাকি! যাচ্ছো কোথায়? ঝোলার ভেতরেই বা কী অতো ভারি-ভারি জিনিস?

ছেলে বললো, যাচ্ছি মায়ের কাছে। ঝোলায় আছে মণিমানিক সোনামোহর। সওদাগর দিয়েছে খুশী হয়ে। ভালো হয়ে থেকে ছিলুম অতো দিন, তার প্রাইজ।

ঘোড়সওয়ার জিভে চুক-চুক শব্দ করে বললো, আহারে, সোনার বাছা! তুমি কি আর পারবে অতোদূরের পথ অতোভারি বোঝাটা কাঁধে নিয়ে! আহা রে! তারচে' বরং ওই হতচ্ছাড়া ঝোলাটা

আমাকে দিয়ে এই ঘোড়াটা তুমি নাও। তাহলে মায়ের কাছে চোখের পলকে পৌঁছে যাবে। নেবে?

সত্যি? অবাক হয়ে শুনে ছেলেটি। তাহলে তো বেশ হয়!

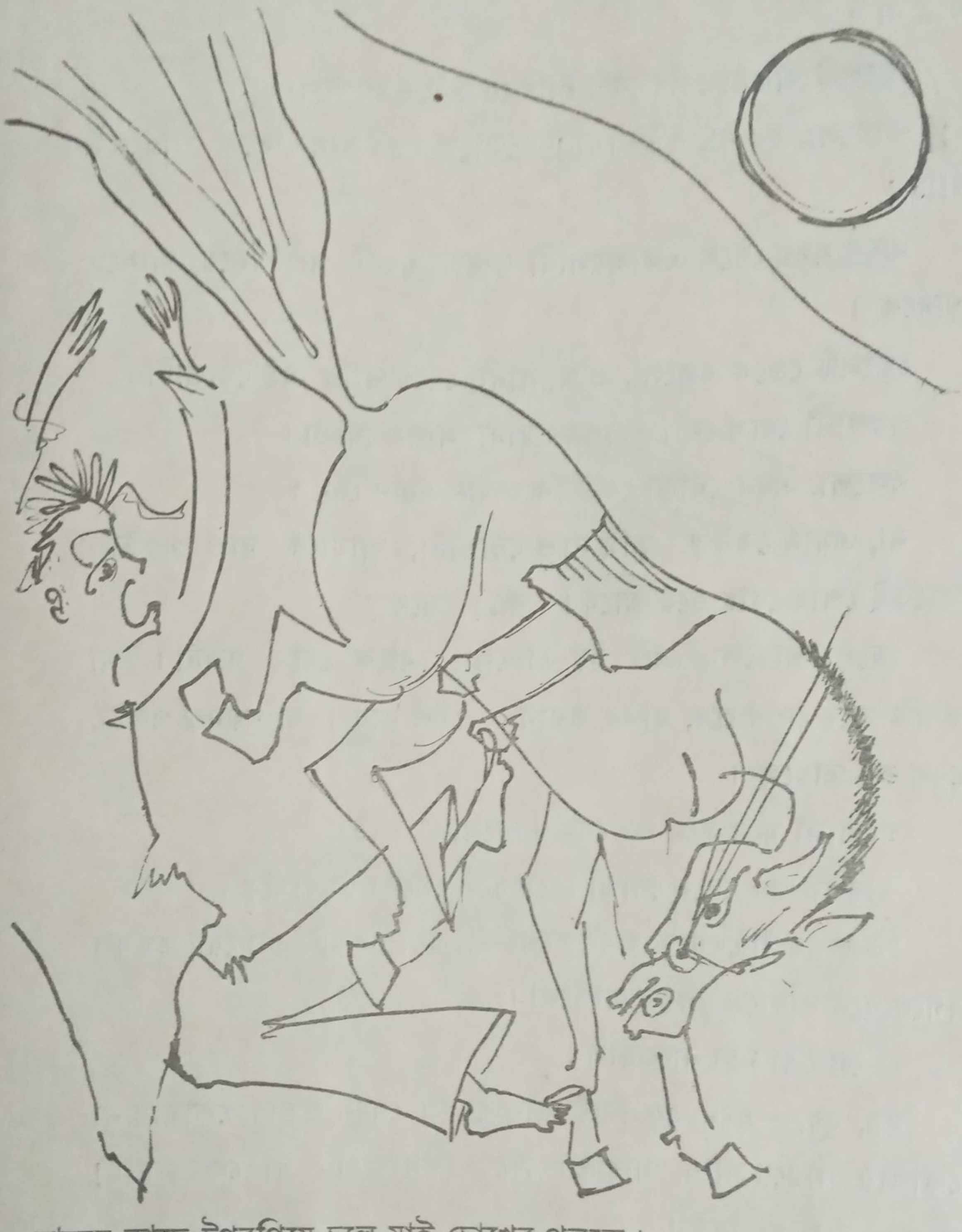

মায়ের কাছে টগবগিয়ে চলে যাই চোখের পলকে।

এই বলে সে ঝোলাটা ওকে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চললো দূরগাঁয়ের পথে।

কিন্তু ঘোড়াটা সুন্দর চকচকে হলে কী হয়, ও ছিলো দারুণ দুষ্টু। কিছুতেই সোজা পথে যাবে না। রাশ টানতে টানতে একদিকে ঘোরায় তো আবার অন্যদিকে পা বাড়ায়। কিছুতেই সামলানো যায় না।

ছেলেটি আরো বেশী বেশী হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো।

ভাবলো, দূর যা, হতভাগা! তোকে দূর করে দিতে পারলেই বাঁচি!

এমন সময় দেখে এক গয়লানী সুন্দর একটি গরু নিয়ে আসছে এদিকে।

ছেলেটি ডেকে বললো, ও গয়লানী, নেবে নাকি এই ঘোড়াটা।

গয়লানী দেখে সে তো দারুণ দামী আরব ঘোড়া।

বললো, এমন ঘোড়া কেউ কি এমনি এমনি দেয়?

না, এমনি কেন? তুমি নাও ঘোড়াটা, আমাকে দাও গরুটা। তাতেই শোধ-বোধ হয়ে যাবে। কী? নেবে?

ছেলে ভাবলো, বেশ হয় তাহলে। মাকে দেবে গরুটা। মা হাঁড়ি ভরে দৈ করবে, মাখন করবে। বেশ হবে। যা পয়মন্ত গরুটা, বেশ হয় তাহলে।

গয়লানী মনে মনে কী যেন ভাবলো।

তারপর গরু দিয়ে ঘোড়া নিয়ে চলে গেলো টগবগিয়ে।

কিন্তু গরুটা দেখতে অমন হলে কী হয়, একটু এগিয়েই কেবল গিয়ে বনে বাদাড়ে ঢুকতে লাগলো।

ছেলে তো মহা নাজেহাল।

দূর, দূর,—এমন গরু নিয়ে কাজ নেই। যেমন স্বভাব, কোথায় না কোথায় হারিয়ে যাবে, আর দুধ দেবে কিনা তাই বা কে জানে! যাকগে যাক দূর হয়ে!

এমন সময় দেখে একটি মেয়ের হাতে সুন্দর সাদা একটা হাঁস। ঝকঝকে রঙ। হলুদ-সোনালী ঠোঁট। হলুদ-সোনালী পা।

ওকে বললো, দেবে নাকি তোমার হাঁসটা আমাকে ? এই গরুটা নিয়ে ?

মেয়ে অবাক হয়ে বললো, যাঃ, তাই কি হয় ? বলে গরু হলো

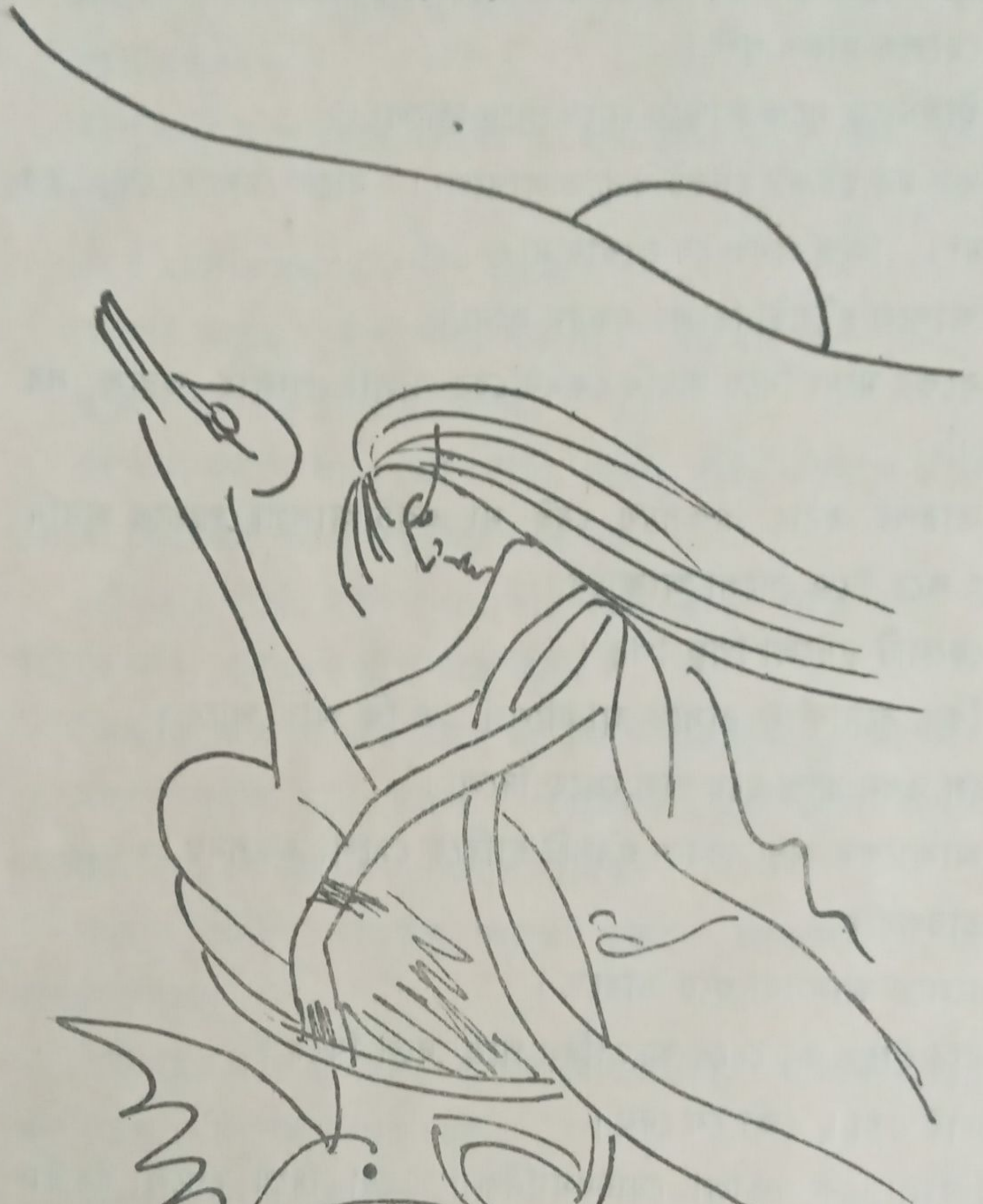

কতো দামী জিনিস ! আর এই হাঁসটা তো ডিম দেয় মোটে দুটো করে !

ছেলে বলে, দুটোই তো বেশ। মাকে দেবো একটা, আমি

নেবো একটা। ছোট্টো সংসার আমাদের ওতেই বেশ চলে যাবে। কী, দেবে নাকি? দেখো।

মেয়ে খুশী হয়ে হাঁস দিয়ে গরু নিয়ে চলে গেলো।

ছেলেও দারুণ খুশী।

হাঁসটাকে বুকে জড়িয়ে নেচে নেচে চললো।

ওর মন ছটফট ছটফট করতে লাগলো। মাকে দেখতে যেন তর সয় না। কিন্তু পথও যে ফুরোয় না—

আসলে হাঁসটা ছিলো একদম বুনো।

বুকের মধ্যে নিয়ে অবধি কেমন যেন পালাই পালাই করছে সব সময়।

তারপর হঠাৎ একসময় যেই না একটু আলগা পেয়েছে অমনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো আকাশে।—

ছেলেটি ছুটলো পিছু পিছু।

কিন্তু বুনোহাঁস ভাসছে আকাশে। ও কি আর পারে?

সে তখন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলো।

আকাশের অন্য কোণে হাঁসটি হারিয়ে গেলো একসময়।

তারপর?

চলেছে আনমনা হয়ে ভাবতে।

মার হাতে কী দেবে অতোদিন পরে দেশে ফিরে?

তাই তো! কী যে দেয়!

ছিলো এক ঝোলা মোহরমানিক। তা দিয়ে পেলো তেজী আরবী ঘোড়া। ঘোড়া দিয়ে পয়মন্ত গরু। গরু দিয়ে হাঁস।

এখন হাঁসও নেই। কিছুই নেই।

হঠাৎ এইসব ভাবতে ভাবতে দারুণ হাসি পেলো ছেলেটির। হাঃ হাঃ হাঃ। হাসি যেন আর থামে না। হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে চোখের কোণ জলে ভরে উঠলো।

কিন্তু মায়ের কাছে খালি হাতে কী করে যে যায়!

অতোদিন পরে!

ভাবতে ভাবতে গরীব ঘরের সেই ছেলেটি চলেছে।

চলতে চলতে পথ এলো ফুরিয়ে।

সন্ধ্যা হয়-হয়

এমন সময় হঠাৎ দেখে, সেকি, ও যে দাঁড়িয়ে আছে তার বাড়ির দাওয়ায়।

দেখে মা তার সন্ধ্যার প্রদীপ দিচ্ছে।

ছেলেটি মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মা, মাগো—

খুশীতে চারদিক ছাপিয়ে গেলো।

সোনাদানার ঝোলা, তেজী ঘোড়া, দুধেল গাই, ঝকঝকে হাঁস—কোনো কিছুতেই অতো সুখ যে হয় নি ওর !

হঠাৎ মনে হলো, মাকে পেয়ে তার খালি হাত খালি যেন আর থাকছে না। কেবলই ভরে ভরে উঠছে।

কিন্তু কিসেতে যে ভরে উঠছে তা বুঝতে পারছে না ভালো করে।

মায়ের বুকও ভরে উঠলো। ছেলেকে বুকে বেঁধে রাখলো। সোনামানিক, সোনামানিক—সোনামানিক—

সন্ধ্যার প্রদীপ আকাশে আলো ছড়াতে লাগলো সে ঘরের দাওয়া থেকে।

একবারও মনে হলো না সে ঘরে মোহর নেই, সোনাদানা নেই। গরু ঘোড়া হাঁসটাস কিছুই নেই।

মনেই হলো না একবারও।

বামনদের পালা শেষ হলো।

পাশে তাকিয়ে দেখি, আরে, লখিনীরা কোথায় গেলো? রাজকুমার আর লখিনা?

আরে আরে, ছিটন্তি হরিণই বা কোথায় গেলো !

সামনে অথৈ মাঠ ফুলে-ফুলে ভরে আছে, টইটম্বুর হয়ে।

জয় আর আমি শুয়ে আছি একটা সরল গাছের গোড়ায়। সরলের ফল পড়ে আছে এখানে ওখানে। আর সরু সরু সূচের মতো পাতায় ছেয়ে আছে নীচটা। আকাশে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে পাখি। উড়ছে ঘুরে ঘুরে। ওদের পাখায় আলো পড়ছে ঠিকরে।

তখন আমাদের চোখের পাতায় ঘুমপরী এসে বসলো।

ঘুমের মধ্যে মনে হলো আমাদের চারপাশে কারা যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে।

চোখ মেলে চেয়ে দেখি অনেকগুলো প্রজাপতি পরী।

আমরা তাকাতেই ওরা সবাই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

জয় বললো, কী ব্যাপার? অতো যে হাসি?

পরীদের একজনের হাতে একসাজি ফুল। বললো, এই ভরদুপুরে বড়ো যে ঘুমিয়ে আছো? এই বেলাতে কেউ ঘুমোয় নাকি?

জয় বললো, যাঃ, দুপুর কোথায়। এই তো সবে রাত পোয়ালো। শোনোনি ককর কক ককর কক করে এই যে ডেকে উঠলো বন মোরগ?

পরী বললো, সে কি ভোরের ডাক? সে হলো ভর দুপুরের ডাক।

কি করে বুঝলে?

বুঝলুম আর কি! একটু বাদে হীরেমানিকের গাড়ি ছাড়বে। বড়ো লাইন, ছোটো লাইন। এ তারই ডাক।

গাড়ির কথা শুনে আমাদের মন কেমন করে উঠলো।

জয়কে বললুম, চলো, ওঠো এই বেলা। কী?

জয় আড়মোড়া ভেঙে সরল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে উঠে বসলো।

দেখি ঘুড়িবুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে দৌড়ে।

ওর কামিজে ছবি আঁকা ময়ূরের। পেখম মেলে নাচছে। ময়ূরের নীলে আর কাশফুল দাঁড়িতে যেন মেঘরোদের খেলা চলেছে।

ঘুড়িবুড়ো বললো, এই নাও, তোমাদের জন্যে এনেছি। দুটো ঝিনুক। একটায় আছে স্বপ্নের জাদু, অন্যটায় ইচ্ছের মন্তর। এই নাও।

আমি বললুম, ঘুড়িবুড়ো আবার কবে দেখা হবে ?

ও হো-হো করে হেসে উঠলো।

হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগলো ওর সারা শরীর।

বললো, দেখা হবার কি আবার সময়-অসময় আছে! ইচ্ছে হলেই দেখা হয়। যখন ইচ্ছে তখন—স্বপ্নের আর ইচ্ছের জাদু তো ওই ঝিনুক দুটোতেই রইলো।

ঝিনুক হাতে নিয়ে হঠাৎ মনে হলো, আহা রে, মা যদি জানতো! হঠাৎ মায়ের জন্যে মন কেমন কেমন করে উঠলো। না-জানি ও এখন কী করছে ? খুঁজেই হয়তো বেড়াচ্ছে আমাকে!

মায়ের কথা মনে হতেই আবার দেখি আমরা চলেছি সেই হীরে-মানিকের গাড়িতে। টুং টুং টিং টিং করে বাজছে নূপুরের ঘন্টা। প্রজাপতিরা বসে আছে চুপচাপ। আর কতো পাখি পাখালি, কতো পোকামাকড়, কতো শামুক ঝিনুক গেঁড়ি-গুগলি, খরগোস-কাঠবিড়ালরা!

যাবে কোথায় হে তোমরা ?

পদ্মপুকুর।

সেখানে গিয়ে ?

সেখানে আজ বসন্তের নেমন্তন্ন।

পরীরা সেখানে গিয়ে নতুন ফাগুনের গান গাইবে।

আমরা চলেছি তো চলেছি।

পরীরা আসছে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে ইষ্টিশান। কেউ নামছে। কেউ উঠছে।

গার্ড সায়েব বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ইষ্টিশানের নাম হাঁকছে।

জয় আনমনা হয়ে থাকলো। মন দারুণ ভারি-ভারি। গাড়ি চলেছে হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে দুলে।

তারপর একসময় টুক করে থামলো।

জয় আর আমি তখন নেমে পড়লুম সেই কুমড়ো-পারা কালো পাথরটার ওপর।

আর যেই না মাটিতে পা রেখেছি অমনি ফট করে পাথরটা গড়িয়ে গিয়ে গর্তটা বুজে গেলো। তখুন আবার সেই সবুজ ঝির-ঝিরে গাছের পাতা। সবুজ পোকারা উড়ছে, বসছে।

আর আকাশে তখন বেলা-শেষের হাওয়া লাগছে একটু একটু করে।

জয় বললো, পা চালিয়ে চল এবার।

বলে জয় পকেটে হাত পুরে পেয়ারা-ডালের ছোট্টো গুলতিটা বের করলো। আর অন্য পকেট থেকে অনেকগুলো নানা রঙের মার্বেলের গুলি।

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, কী করে!

জয়ের চোখ লাল। নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে। ফোকলা দাঁত দেখা যাচ্ছে না।

হাতে গুলতি আর মার্বেলের গুলি নিয়ে জয় গুটি-গুটি এগোচ্ছে।

আমরা পায়ে পায়ে চলেছি বারোয়ারীতলার দিকে, যেখানে কন্টিকারি আর কালমেঘের বন।

সেখানে এসে জয় হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো।

তারপর গুলতি আর গুলিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো জংগলে।

ওর পকেটে তখন পরীদের রানীর ছোঁয়া-লাগা আতস কাঁচ। আর ভাইবোন ফুলের পাসপোর্ট।

আর রইলো স্বপ্ন আর ইচ্ছের জাদু-ভরা ঝিনুক আমার হাতে। বেলুনবুড়ো যে দিয়েছিলো।

চলেছি আমরা দুটিতে হাত ধরে।

এমন সময়!

দেখি লক্ষ্মণদাদা আসছে হনহনিয়ে।

ও আমাদের দেখতে পেলো না। আমরা চুপি-চুপি ওকে দেখতে লাগলুম।

ওকে দেখে সেই লম্বা সুপুরী গাছটার কথা মনে পড়লো। যেন বৈশাখের হাওয়ায় মাথা ঝাঁকিয়ে নাচছে। দূর থেকে দেখলুম ওর গলার ডিমটা কলকের বিচির মতো, লেগে আছে কণ্ঠার কাছে।

লক্ষ্মণদাদা পরেছে সাদা জামা। মাথায় সাদা টুপি।

হঠাৎ বাঁক ঘুরে অন্যপথ ধরতেই জয় থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে ইশারায় বললো, চুপ!

তখন সন্ধ্যার পাখিরা দলে দলে ফিরে আসছে বটগাছের বাসায়। মাথার ওপর নানা শব্দের মিছিল।

আকাশভরা কুমকুম। সূর্য যাচ্ছে পাটে।

দেখি হঠাৎ লক্ষ্মণদাদা বটের শেকড়ের দিকে চলেছে। তারপর ওই কালো পাথরটা ঠেলে টুপ করে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। আর দেখা গেলো না।

আমাদের বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

লক্ষ্মণ দেয় ক্যানেস্তারায় করে জল। বাড়ি-বাড়ি। কৌটোয় পানের খিলি। সে তো সবাই জানে। কিন্তু কোথায় যে ওর বাসা, তা তো কেউ জানে না!

জয় আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো। আমিও হাসলুম।

আমাদের আতস কাঁচে ছবি ফুটে উঠলো ওর।

দেখি রূপোমোড়া গাড়িতে করে চলেছে আনমনা হয়ে। ঘণ্টা বাজছে টিনটিন। পরীরা ওর গায়ে-গালে বসছে। গাড়ি চলেছে হীরেমানিক। যেখানে বড়ো লাইনের গাড়ি করে—সোনানূপুর যাবার ইস্টিশান।

যেখানে পরীদের রানীর সংগে দেখা হয়েছিলো আমাদের।